বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

উপযোগী প্রযুক্তি

বিজ্ঞানের ইতিহাস ঃ অন্য ছবি

ধানচাষে 'সবুজ বিপ্লব'

কীটনাশক

পারমানবিক শক্তি নিষিদ্ধ হল

স্বাস্থ্য-ওষুধ-মানুষ

প্রযুক্তি যখন আবর্জনা

অষ্টম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা মার্চ-এপ্রিল 1985

দাম দু টাকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

অষ্টম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা

মার্চ-এপ্রিল 1985

ভূপালে আরো কত মানুষ মারা যাবে ☐ প্রযুক্তি : তত্ত্ব ও প্রয়োগ-কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ বিজ্ঞানের ইতিহাস : অন্য ছবি -অভিজিৎ লাহিড়ী ☐ সবুজ বিপ্লব : ধান চাষের একটি সমীক্ষা -প্রদীপ দত্ত ও ধ্রুবজ্যোতি দে ☐ জনস্বাস্থ্য বনাম কীটনাশক-সুব্রত শীল ☐ পরিক্রমা ☐ Stop N-Power ডেনমার্কের সিদ্ধান্ত ☐ পারমানবিক চুক্তির সংকট-সুখেন্দু সরকার ☐ স্বাস্থ্য-ওষুধ -মানুষ-ডাঃ সুজিত কুমার দাস ☐ টেকনোলজি ডাম্পিং-রবীন চক্রবর্ত্তী ☐ চিঠিপত্র ☐ প্রচ্ছদ-অতি দাস ☐ কার্টুন-সুপর্ণ চৌধুরী।

গ্রাহক ও এজেন্টদের প্রতি

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায় ☐ বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার বার টাকা ☐ প্রতিষ্ঠানিক চাঁদা—চল্লিশ টাকা ☐ বাংলাদেশের জন্য —ভারতীয় টাকায় কুড়ি টাকা ☐ বিদেশী গ্রাহকদের চাঁদা বার্ষিক কুড়ি ডলার ☐ এজেন্ট কমিশন : দশ কপির উপর পঁচিশ শতাংশ এবং একশ কপির উপর তেত্রিশ শতাংশ ☐ এজেন্সীর জন্য নীচের ঠিকানায় লিখুন।

যোগাযোগের ঠিকানা

প্রতি সোমবার সন্ধ্যা সাতটায় সেন্ট্রাল এভিনিউ ও বৌবাজার স্ট্রিটের সংযোগস্থলে বৌবাজার পোস্ট অফিসের বিপরীতে 52/9C বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা–700012 ঠিকানায় দোতালায় ডি. এস. এন্টারপ্রাইজের ঘর ☐ প্রতি বুধ ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় 2/1A আশুতোষ শীল লেন, কলিকাতা-9 (শুকিয়া ষ্টীটে ঢুকে খোঁজ করুন) ☐ ডাকে যোগাযোগের ঠিকানা—অভিজিৎ লাহিড়ী, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, EC 106 সল্টলেক, কলকাতা-700064।

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

ভূপালে আরো কত মানুষ মারা যাবে

"...আর, তোমার আত্মীয়স্বজন, যারা সেদিন রাতে মারা যায় নি, তাদের জন্য চিন্তা ক'রোন শিগ্‌গীরই তারা তোমার সাথে মিলিত হবে।"

ভূপালের গ্যাস দুর্ঘটনার পর তিন/চার মাস কেটে গেল। কিন্তু এখনো ওখানকার বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত রোগীদের সুষ্ঠু চিকিৎসার যথার্থ কোনো ব্যবস্থাই করা হয়নি। কয়েকশো রোগী প্রত্যহ মধ্যপ্রদেশ সরকারের ত্রিশ-শয্যা বিশিষ্ট বিশেষ হাসপাতালে ভিড় করেন চিকিৎসার স্বপ্ন নিয়ে, আর ফিরে আসেন কতকগুলো এ্যান্টিবায়োটিক্ বা সাধারণ জ্বর, সর্দি কাশির ওষুধ নিয়ে। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের কোনো চিকিৎসাই হচ্ছে না। সম্প্রতি 'মেডিকো ফ্রেন্ডস সার্কল' ওখানে একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন, রোগীরা ভুগছেন মারাত্মক কতকগুলি অসুখ থেকে। যেমন শ্বাসকষ্ট, দৃষ্টহীনতা, শুকনো কাশি, মাথার যন্ত্রণা, অজীর্ণ অবসাদ, পেশীর যন্ত্রণা। ঐ স্টাডি সার্কলের ডাঃ অনিল প্যাটেল বলেন, সমস্ত রোগীদের আজও কেন সোডিয়াম থায়োসালফেট ইন্‌জেকশন দেওয়া হয় নি, এটি অত্যন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—ICMRঅনেক আগেই 276 জন রোগীকে এই ইন্‌জেকশন দিয়ে সুফল পেয়েছিলেন)। সোডিয়াম থায়োসালফেটের কোনো অভাবও হবার কথা নয়। 'মেডিকো ফ্রেন্ডস' তাঁদের রিপোর্ট মধ্যপ্রদেশ সরকারকে দিয়েছেন। এদিকে 4ঠা ডিসেম্বরের বিষাক্ত গ্যাস আক্রান্ত মানুষদের সংস্থা 'জাহ্‌রিলী' গ্যাস কাণ্ড সংঘর্ষ মোর্চা' আন্দোলন শুরু ক'রেছেন সত্যিকারের চিকিৎসার দাবীতে। ঐ সংস্থা পোস্টার দিয়েছেন, 'আমাদের স্বাস্থ্য নিয়ে খেলা নয়', 'আমাদের শরীর থেকে সায়ানাইড দূর করো,' ইত্যাদি।

ভূপালে যখন ঐ করুণ চিত্র, তখন আমাদের মন্ত্রী মহাশয় শ্রীযোগেন্দ্র মাকোয়ানা লোকসভায় দাবী ক'রেছেন গ্যাস দুর্ঘটনার পরে যে সব শিশু ভূপালে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তারা যথেষ্ট স্বাভাবিক (ICMR রিপোর্ট)। অথচ সিটিজেনস্ কমিটি (ভূপালের ডাক্তার, বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিক, অধ্যাপকদের একটি সংস্থা) এক সমীক্ষায় দেখেছেন গ্যাস দুর্ঘটনার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ 112টি গর্ভপাত ও 40টি মৃত শিশুর জন্ম হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশ সরকার ইউনিয়ন কার্বাইডের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত; কিন্তু তাঁরা যেন খেয়াল রাখেন ঐ গ্যাস দুর্ঘটনায় আক্রান্ত মানুষদের বাঁচানো ও তাঁদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনা আরো গুরুত্বপূর্ণ। আক্রান্ত ঐ হাজার হাজার মানুষদের শতকরা 70-80 ভাগ এখন শারিরীকভাবে সম্পূর্ণ পঙ্গু ও কর্মসংস্থানবিহীন। আর আজও ৩রা ডিসেম্বর যে গ্যাস বেরিয়ে ঐ ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড ঘটায়, তা সত্যি কি ছিল, সেই রহস্যের সমাধান করা হ'ল না। এই রহস্যজনক গোপনীয়তার জন্য ডাক্তাররাও ঠিক কি চিকিৎসা করবেন, সে ব্যাপারে এখনো দ্বিধাগ্রস্থ।

এ অবস্থার পরিবর্তন চাই।

'উপযোগী প্রযুক্তি' ব্যাপারটা কি? কি এর লক্ষ্য, বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতি? এদেশে উপযোগী প্রযুক্তি নিয়ে চিন্তাভাবনা কাজকর্ম কোথায় হচ্ছে? একটি প্রাথমিক পরিচিতি।

প্রযুক্তি ঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ

—কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

1972 সালে 'ক্লাব অভ রোম' নামে একটি সংস্থার পক্ষ থেকে The Limits to Growth নামে ছোট একটি বই প্রকাশিত হবার পর সারা বিশ্ব জুড়ে এক বিতর্কের শুরু হয়। ঐ বইয়ে বলা হয়েছিল যে, এই হারে প্রাকৃতিক সম্পদ ও জ্বালানীর ব্যবহার এবং জনসংখ্যা বেড়ে চলতে থাকলে শীঘ্রই পৃথিবীর সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ফুরিয়ে আসবে, ফলে সভ্যতা ধ্বংসের মুখোমুখি হবে। তারপর দশ বছরেরও বেশী পার হয়েছে। ঐ বইয়ের আশঙ্কাগুলি আজ কিছুটা অতিরঞ্জিত বলে মনে হলেও, তাঁদের উদ্বেগের কারণটি বুঝতে অসুবিধে হয় না।

আধুনিক পাশ্চাত্য প্রযুক্তিকৌশলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জ্বালানী, মূলধন ও শ্রমিকের দক্ষতা খুব বেশী জরুরী। পাশ্চাত্যে প্রযুক্তি-বিদ্যায় শ্রমনির্ভর (labour-intensive) পদ্ধতির পরে পুঁজি-নির্ভর (capital-intensive) পদ্ধতি ও সম্প্রতি তথ্যনির্ভর (knowledge-intensive) পদ্ধতির প্রাধান্য বেড়ে চলেছে।[1] কম্পিউটার-সায়েন্স, সাইবারনেটিক্স, রোবোটিক্স ইত্যাদি বিষয়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ আরো অনেক কম কর্মীকে ব্যবহার করে অনেক বেশী উৎপাদন সম্ভব হয়ে উঠছে। পাশাপাশি অদূরদর্শী-ভাবে মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার, অপচয় এবং পরিবেশ-গত ভারসাম্যের অবনতি ঘটছে।

তৃতীয় বিশ্বের সমস্যা

তৃতীয় বিশ্বের পরিস্থিতি আরো জটিল। এই সমস্যাগুলোর সঙ্গে বাড়তি সমস্যা হিসেবে রয়েছে জনসংখ্যার চাপ, অশিক্ষা, তীব্র দারিদ্র্য এবং উন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক শোষণ ও আধিপত্য। একটি সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে 1977 সালে পাশ্চাত্য আর্থিক সহায়তার অর্ধেকের চেয়ে বেশী ক্ষেত্রে শর্ত ছিলো—সহায়ক দেশ থেকে যন্ত্রাংশ কিনতে হবে। এর ফলে পাশ্চাত্য প্রযুক্তি ও বিশেষ কিছু যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর উন্নয়নশীল দেশগুলি ক্রমশঃ বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়তে থাকে, যা স্থানীয় শিল্প ও প্রযুক্তি বিকাশের প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়। এই ধরনের বেশীর ভাগ দেশই শুধুমাত্র যন্ত্র (hardware) কেনে, কিভাবে নিজের দেশে তা তৈরী করা যায় সেই প্রযুক্তিকৌশল আয়ত্ত করে না। ফলে মাদক দ্রব্যের নেশার মত বিদেশী প্রযুক্তিকৌশল ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের ওপর তাদের নির্ভরশীলতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। শুধুমাত্র প্রযুক্তি-আমদানির মাধ্যমে প্রযুক্তিতে আত্মনির্ভর হওয়া যায় না। ভারতবর্ষের প্রযুক্তি-আমদানির পদ্ধতিতে 'মাইক্রো-প্রসেসরের' ক্ষেত্রে সুফল ফলেনি; অথচ দক্ষিণ কোরিয়া এ বিষয়ের আধুনিকতম প্রযুক্তি-কৌশলকে আয়ত্ত করতে পেরেছে।

প্রযুক্তি-আমদানিকারী দেগগুলির অজ্ঞতার সুযোগে অনেক ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলি তাদের পুরনো বাতিল প্রযুক্তিকৌশল ও যন্ত্রপাতি বিক্রি করে প্রতারিত করে থাকে। অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের অনেক সরকারই 'উপযোগী প্রযুক্তি' (Appropriate Technology)-কে একেবারে দেখতে পারে না; মনে করে —আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলির আধিপত্য বজায় রাখার জন্য এটা একটা নয়া সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত।

Grumman International—এর সহ-সভাপতি অস-ওয়াল্ড উইলিয়াম্সের মতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি প্রযুক্তি আমদানির সময় নিজের দেশের বাস্তব প্রয়োজনের মূল্যায়ন, উপযুক্ত বাণিজ্য সংস্থা মনোনয়ন, প্রয়োজনমত আধুনিক যন্ত্রপাতি চয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রায়ই ভুল করে থাকে, এবং এছাড়াও বদ্ধমূল বিশ্বাস রাখে যে প্রযুক্তিদাতা প্রতিষ্ঠানটি এ ব্যাপারে সর্বজ্ঞ। তিনি মনে করেন, ভারতবর্ষের উচিৎ অটোমেশন ও শ্রমনির্ভর প্রযুক্তিকৌশলের মধ্যে ভারসাম্য রেখে এগোনো।[3] আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি পাশ্চাত্য দেশগুলির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হওয়ায় ওদেশে যে ধরনের প্রযুক্তি উপযোগী, আমাদের ক্ষেত্রে সর্বত্র তা নয়।

1961 সালে আমাদের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু গ্রামীন ভারতের উন্নয়নের রূপরেখার ব্যাপারে পরামর্শ দেবার জন্য ব্রিটেনের ন্যাশনাল কোল বোর্ডের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা Ernst Schumacher-কে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসেন। তাঁর এই সফরের ফলেই Intermediate Technology তত্ত্বের জন্ম হয়। 'উপযোগী প্রযুক্তি' (Appropriate Technology)-কে বলা যেতে পারে Intermediate Technology-রই পরিমার্জিত সংস্করণ। তাঁর রিপোর্টের মূল লক্ষ্য ছিলো, যে কৃষি-বহির্ভূত কার্যকলাপগুলি (non-agricultural activities) বহু মানুষকে কর্মসংস্থান দিয়ে শহরমুখী জনস্রোতে সামিল হওয়া (migration) থেকে বিরত রেখেছে, সেগুলিকে চিহ্নিত করা। পরে Small is Beautiful বইতে তাঁর এই চিন্তাধারাকে তিনি লিখিত রূপ দেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমশঃ স্বকৃতি লাভ করতে থাকে। UNICEF, WHO, ILO, UNIDO, বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং এদেশে National Research & Development Corpn. (NRDC) তাদের বিভিন্ন প্রকল্পে এই চিন্তাধারাকে কার্যকরীভাবে নানা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে চলেছে।

উপযোগী প্রযুক্তি বলতে কী বোঝায়

উপযোগী প্রযুক্তির (Appropriate Technology) সংজ্ঞা দিতে গেলে বলতে হয়— "এটি প্রযুক্তিকৌশলের এমন একটি সমষ্টি যাতে নির্দিষ্ট পরিবেশে প্রাপ্ত সম্পদ-গুলির (resources) সার্থক ব্যবহারের মাধ্যমে সামাজিক

প্রয়োজনকে কার্যকরীভাবে পূরণ করা যায়" (The set of techniques which make optimum use of available resourses in a given environment to maximise social welfare.)[4]

বীরভূমের নিংহা গ্রামের আবদুল আলিম নিজস্ব প্রচেষ্টায় একটি প্যাডেলচালিত পাম্পসেট তৈরী করেছেন। গ্রামাঞ্চলে চাষে জলসেচের জন্য ও অন্যান্য প্রয়োজনে স্বল্প খরচে এই যন্ত্রকে ব্যবহার করা যাবে। 1981 সালের দারুণ খরার সময়ে পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে ঢেঁকিকে গ্রামবাসীরা নলকূপ বসানোর কাজে ব্যবহার করেছেন বলে জানা গেছে। আমাদের রাস্তায় যে রিকশা চলে, বা প্রয়োজনের তাগিদে তার যে উন্নত সংস্করণ অটোরিকশা,—এ সবই বিশেষ পরিবেশের ক্ষেত্রে 'উপযোগী'।

'উপযোগী প্রযুক্তি'-র প্রবক্তাদের দৃষ্টিভঙ্গী মোটামুটি এই রকম—

1 'উপযোগী প্রযুক্তি' বলতে বোঝায় স্থানীয় জীবনধারা ও সামর্থ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সন্তোষজনক প্রযুক্তিগত সমাধান। জনসাধারণের নিজেদের সমস্যাকে নিজস্ব সংস্কৃতি ও সম্পদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজেরাই সমাধান করার সামার্থ্য গড়ে তোলাও এর অন্যতম অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। এই স্বনির্ভরতা (self-reliance) ও স্বয়ংভরতা (self-sufficiency) কিন্তু আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সঙ্গে সম্পর্কহীন নয়। স্বয়ংভরতার প্রয়োজনে বাইরে থেকে নানা ধরনের সহযোগিতাও গ্রহণ করতে হতে পারে।

2. এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, নির্দিষ্ট কোনো একটি সমস্যার সমাধানে যে সব বিভিন্ন পন্থা গৃহীত হয় তাদের sophistication-এর মাত্রা সংশ্লিষ্ট সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সর্বদা সমানুপাতিক হবে—'উপযোগী প্রযুক্তি'-র দৃষ্টিভঙ্গী এ কথা বলে না। এর উল্টোটাও হতে পারে।[5]

দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়—যে দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি এরোপ্লেন, মেট্রোরেল, মনোরেল ইত্যাদি যানবাহনকে ব্যবহার করতে সক্ষম, সে দেশেরই কোনো এক অঞ্চলের অফিসযাত্রীরা দৈনিক গড়ে চার কিলোমিটার যাত্রাপথের জন্য ট্রেন বা বাসের পরিবর্তে সাইকেল বা মোপেড ব্যবহার করতে পারে, জ্বালানী সাশ্রয়, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি সুবিধার কথা ভেবে।

উপযোগী প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

সামাজিক অর্থনৈতিক প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিবেচনা করে 'প্রযুক্তি নির্বাচনের' ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয়কে তুলনামূলকভাবে প্রাধান্য (preference) দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন, যে প্রযুক্তিগুলি—

1. জ্বালানী ও বিনিয়োগ ব্যয় কমায় এবং বেশী কর্মীর কর্মসংস্থান করে
2. ক্ষুদ্রায়তন বিকেন্দ্রীভূত ইউনিটে উৎপাদন করে থাকে
3. স্থানীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে এবং স্থানীয় শিল্পকাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় তাদের ভারসাম্যকে বিপর্যস্ত করে না
4. সম্পদ ও উপাদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে মূলতঃ স্থানীয় উপাদান ও মানুষের দক্ষতার উপর নির্ভরশীল
5. বিত্তবানদের জন্য বিলাস-সামগ্রী নয়, বৃহত্তর জনসমষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপন্ন করে
6. যন্ত্রের প্রয়োজনে মানুষকে ব্যবহারের পরিবর্তে মানুষের প্রয়োজনে যন্ত্রকে ব্যবহার করে।[6]

পাশ্চাত্য আধুনিক প্রযুক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী

কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযোগী প্রযুক্তিটি ক্ষুদ্রায়তন বা শ্রম-নির্ভর (labour-intensive) নাও হতে পারে। যেমন পেট্রোকেমিক্যাল ও সার উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৃহদায়তন উৎপাদনের ফলে জ্বালানী ও সম্পদের সাশ্রয় হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও সামগ্রিক উৎপাদনপদ্ধতিকে সাধারণতঃ অখণ্ড বলে ভাবা হয়; তা না করে অন্তর্বর্তী ধাপগুলিতে লাভজনক ভাবে শ্রমনির্ভর পদ্ধতিতে উৎপাদন করা সম্ভব।

থাইল্যাণ্ডে ইণ্টারন্যাশনাল লেবার অর্গনাইজেশনের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে আধা-স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির তুলনায় **তিনগুণ সস্তায়** ধাতব পাত্র (can) তৈরী করা যাচ্ছে। আমাদের দেশেও Planning Research and Action Institute, Lucknow-এর আবিষ্কৃত ছোট চিনি-কল (mini sugar plant) দেখা গেছে 10,000 **মানুষের কর্মসংস্থান** করে এবং চিনির দাম দাঁড়ায় 2.36 টাকা প্রতি কিলোগ্রাম; যেখানে বড় চিনি-কল মাত্র 900 **জনের কর্মসংস্থান** করে এবং চিনির দাম দাঁড়ায় 2·50 টাকা প্রতি কিলোগ্রাম।[7]

Technology for a Changing world বইতে জন ডেভিস 'উপযোগী প্রযুক্তি' সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—"**এই প্রযুক্তি আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যা কিছু অবদান তাকে প্রত্যাখ্যানের ভিত্তির ওপর গড়ে উঠবে না। বরং এই প্রযুক্তির জন্য মানুষের দক্ষতা ও উদ্ভাবনীশক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ সমন্বয় প্রয়োজন হবে; কিন্তু সেগুলি এক ভিন্নতর অগ্রাধিকারের লক্ষ্যে পরিচালিত হবে,** যার ফলে প্রযুক্তির বর্তমান অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যগুলি কাটিয়ে ওঠা যাবে।"

'উপযোগী প্রযুক্তি' কোথা থেকে আসে

মোটামুটি চারভাবে 'উপযোগী প্রযুক্তি' কে পাওয়া যেতে পারে—

(1) দেশজ প্রযুক্তির উন্নয়ন (Improving Indigenous Technology)

গ্রাম, গঞ্জ, মফস্বল শহরে যে সমস্ত প্রযুক্তিকৌশল বহুদিন ধরে প্রচলিত রয়েছে, সেগুলিকে সমীক্ষা করে তাদের দক্ষতা (efficiency) বৃদ্ধির বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(2) রূপান্তর (Adapting)

কোন কোন আধুনিক প্রযুক্তিকে 'উপযোগী প্রযুক্তি'তে রূপান্তর ঘটানো যায় শুধুমাত্র তার কিছু শ্রমসাশ্রয়কারী কৌশলগুলিকে (labour-saving elements) অপসারণ করে, যেমন বৈদ্যুতিক মোটরের পরিবর্তে হস্তচালিত লিভার ব্যবহার করা, ইত্যাদি। নিউজপ্রিন্ট, সিমেন্ট, চিনি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকে অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন শিল্পে রূপান্তর করাও (scaling down) উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে লাভজনক।

(3) উদ্ভাবন (Inventing)

উপযোগী প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নতুন মৌলিক আবিষ্কার এবং পুরাতন ও বর্তমান প্রযুক্তিকৌশলের সমন্বয়ে নতুন প্রযুক্তিকৌশলের আবিষ্কারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

(4) পুনরাবির্ভাব (Reviving)

গত শতকে যখন পাশ্চাত্যে শ্রমিক সুলভ ছিলো এবং বৃহৎ শিল্পের প্রচলন সবে শুরু হয়েছে, সেই সময়কার কিছু প্রযুক্তি-কৌশল পাশ্চাত্যে পরবর্তীকালে অপ্রচলিত হয়ে পড়লেও উন্নয়নশীল দেশের বর্তমান পরিস্থিতির পক্ষে সুন্দরভাবে উপযোগী।

কয়েকটি সংস্থা

Ernst Schumacher তাঁর চিন্তাকে বাস্তবে প্রয়োগ ও প্রসার করার জন্য 1965 সালে লণ্ডনে Intermediate Technology Development Group স্থাপন করেন। মূলতঃ ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র করে এদেশে কয়েকটি সংস্থা 'উপযোগী প্রযুক্তি' নিয়ে নানা ধরনের কাজ করে চলেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি হলো—

1. Appropriate Technology Development Association, Lucknow
2. Centre for Appropriate Technology, College of Engg., Guindy, Madras
3. Application of Science & Technology for Rural Areas (ASTRA), Indian Institute of Sciences, Bangalore
4. Centre for Development of Rural Technology, Allahabad
5. Small Industries Research Training & Development Organisation, B.I.T., Mesra, Ranchi
6. Appropriate Technology Development Unit, Baranasi
7. Center for Rural Development and Appropriate Technology, Indian Institute of Technology, New Delhi
8. Center for Rural Development, Indian Institute of Technology, Madras
9. Center for Regional and Ecological Science Studies in Development Alternatives (CRESSIDA), Calcutta

উপরোক্ত কয়েকটির কর্মধারার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(i) Appropriate Technology Development Association, Lucknow

এই সংস্থা তার লক্ষ্য পূরণের জন্য যে কর্মসূচী নিয়েছে তা প্রধানত ঃ—

1. কুমোর, কামার, ছুতোর, তাঁতী, চর্মকার প্রভৃতি গ্রামীণ পেশাজীবীদের প্রযুক্তিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নত করা
2. চিনি, সিমেন্ট, কাগজ, প্রভৃতি বৃহদায়তন শিল্পকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে রূপান্তরিত করা
3. গ্রামের মানুষদের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলিকে উন্নত করা, যেমন—গৃহনির্মাণের উপকরণ, উন্নত উনুন বা স্টোভ, সৌরচুল্লী, পানীয় জল ইত্যাদি।
4. উন্নত কৃষি-যন্ত্রপাতি, সৌরশক্তি, জলজ শক্তি, গোবর থেকে শক্তি উৎপাদন, ইত্যাদি বিষয়ে উদ্ভাবনী গবেষণা।

এ ছাড়া সংস্থা সারা বিশ্বের Appropriate Technology অনুশীলনকারীদের (practitioner) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। সংস্থার গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।

(ii) Center for Appropriate Technology, Guindy, Madras

এই সংস্থার প্রধান কাজগুলি—

1. 'উপযোগী প্রযুক্তি'র বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্প চালিয়ে যাওয়া
2. 'উপযোগী প্রযুক্তি' সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ

এ ছাড়া এই সংস্থাও 'উপযোগী প্রযুক্তি' বিষয়ে কিছু শিক্ষা-ক্রম চালু করতে চলেছে। সংস্থার গ্রন্থাগারে প্রাসঙ্গিক বই ও পত্র-পত্রিকার একটি সংগ্রহ রয়েছে।

এই কলেজের প্রায় 15টি ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের অধীনে যে সমস্ত প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে বা আংশিক সম্পূর্ণ হয়েছে তার কয়েকটি হোলো—জৈব গ্যাস প্রকল্প, হাওয়া-কল, রাস্তার আবর্জনা থেকে জ্বালানী, স্বল্পমূল্য অটোমেশন, সৌরশক্তিচালিত water heater, সৌরশক্তিচালিত রেফ্রিজারেটর, খালের জন্য water wheel, সাইকেল-চালিত Reciprocating Pump, প্যাডেলচালিত কুমোরের চাকা, সৌর-চুল্লী, প্যাডেলচালিত গাড়ী।

(iii) Center for Development of Rural Technology, Allahabad

এই সংস্থার উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে—

1. 'উপযোগী প্রযুক্তির' বিকাশ ও আধুনিক প্রযুক্তিকে 'উপযোগী প্রযুক্তি'তে রূপান্তর
2. 'উপযোগী প্রযুক্তি'র প্রদর্শন (demonstration) ও প্রয়োগ সংক্রান্ত সমীক্ষা
3. প্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রকাশনা ও তথ্যসংগ্রহ
4. প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রচার ও প্রসার
5. প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ

যে সব বিষয়ে এই সংস্থা কাজ করে চলেছে—

1. পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি (Renewable sources of energy : সৌর, বায়ু, জৈব ইত্যাদি)
2. জনস্বাস্থ্য
3. জল উত্তোলক যন্ত্র
4. গৃহস্থালী উপকরণ/গৃহস্থালী সংক্রান্ত প্রযুক্তি
5. কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি

এছাড়া এই সংস্থার একটি তথ্যকেন্দ্র প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ (Information Service) করে থাকে। এবং সংস্থার পরামর্শ বিভাগ প্রযুক্তিগত পরামর্শ (consultancy) দিয়ে থাকে।

প্রবন্ধসূত্র :—

1. Global Stakes : The future of High Technology in America—Botkin & Stata
2. Third world Tomorrow—Paul Harrison
3. The Statesman, Calcutta, 20 May, 1984
4. Technology and Underdevelopment—Frances Stewart
5. Appropriate Technology in Civil Enng. : Proceedings of Conference held by the Institution of Civil Engineers
6. Appropriate Technology for Third World Development—Edited by Austin Robinson
7. Appropriate Technology—P. D. Dunn
8. Appropriate Technology : Problems and Promises—Edited by Nicolas Jcquier
9. Small is Beautiful—E.F. Schumacher
10. Small is Possible—George McRobi

With best compliments of :

S. GUPTA.

KACHHARI PATTY,
BOLPUR
BIRBHUM

বিজ্ঞানের ইতিহাস ঃ অন্য ছবি

বিজ্ঞানের স্বরূপ, গতিপ্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে কয়েকটি মৌলিক অথচ অবিশ্লেষিত ধারণাকে ভালভাবে যাচাই করে নেওয়া দরকার। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের সাফল্য এত বেশী যে বিজ্ঞানের অন্য কোনো 'মডেল' সম্ভব কিনা আমরা ভেবেই দেখি না। বিজ্ঞানের ইতিহাস এ ব্যাপারে আমাদেরকে দিকনির্দেশ দিতে পারে।

—অভিজিৎ লাহিড়ী

বিজ্ঞানের ইতিহাসকে একটা গৌণ বিষয় বলে ভাবার অভ্যাসটা আমাদের মনের গভীরে ঢুকে গেছে। কারণ আমাদেরকে বিজ্ঞান পড়ান হয়েছে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে। আর ইস্কুলকলেজে বিজ্ঞান পড়ে সেই দৃষ্টিকোণটা আমরাও আত্মস্থ করে ফেলেছি। যারা স্কুল-কলেজে বিজ্ঞান সেভাবে পড়ে নি তাদের কাছেও এই দৃষ্টিভঙ্গীটা পেঁছে যাচ্ছে ব্যক্তিগত কথাবার্তা, রেডিওটি-ভিখবরের কাগজ ম্যাগাজিনের মাধ্যমে। ফলে বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটা ছবি—বা, বলা যেতে পারে, বিজ্ঞানের একটা 'মডেল'—গেঁথে যাচ্ছে সকলেরই মনে। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির সাফল্য এই মডেলটাকে আরো প্রশ্নাতীত স্তরে নিয়ে গেছে। কারণ আসলে এটা পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানেরই অন্তর্নিহিত মডেল। শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী পর্যায়ের 'আধুনিক' বিজ্ঞানের বিকাশের ইতিহাসে লীন হয়ে আছে এই মডেলের দৃষ্টিভঙ্গী।

এই দৃষ্টিভঙ্গীকে সাধারণত 'বস্তুবাদ' আখ্যা দেওয়া হয়। এবং এর থেকে আলাদা সব কিছুকেই, ধরে নেওয়া হয়, ভাববাদী চিন্তাধারায় সংক্রামিত—বিজ্ঞানবিরোধী। 'ভাববাদী' 'অজ্ঞেয়তা-বাদী', 'বিজ্ঞানবিরোধী,' এইসব কথাগুলো খুব সহজে বলার ছাড়-পত্র পেয়ে গেছে মানুষ। এগুলো ব্যবহার করলে অনেক সংশয়, অনেক প্রশ্ন এড়ান যায়। একটা আত্মবিশ্বাসের ভাব আসে। অবশ্য বিজ্ঞানের নানান বিষয়ে অনেকের আত্মবিশ্বাস ঘা খেয়েছে বহুবার বহুভাবে। বিশেষত গত শতক আর এই শতকের অনেকগুলো সুদূরপ্রসারী আবিষ্কার অনেক চিন্তাভাবনাকে ওলট-পালট করে দিয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান কি, এ সম্পর্কে ধারণা ঘা খাওয়ার বদলে বরং আরো যেন মজবুত হয়েছে। মানুষ অনেক বেশী নির্বিচারে মেনে নিচ্ছে এই ধারণাকে।

বিজ্ঞান সম্পর্কে এই চালু ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গীটা ঠিক কি, তা স্পষ্ট করে বলা অবশ্য কঠিন। তবে কয়েকটা মূল ব্যাপার এভাবে বলা যেতে পারে—

মানুষের চিন্তাভাবনা-নিরপেক্ষ একটা প্রাকৃতিক বাস্তবতা আছে, যা আমরা পুরোটা জানি না, কিন্তু জানতে চাই। জানার পদ্ধতি হিসাবে বাস্তব অভিজ্ঞতা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তত্ত্ব তৈরী করি। বাস্তবতার অনেক দিক, অনেক জটিল গতিপ্রকৃতি। বিজ্ঞানেরও অনেক শাখা, অনেক বিভাগ—প্রতিটি শাখাতেই তত্ত্ব ধাপে ধাপে বাস্তবতার কাছাকাছি এগিয়ে চলেছে। একটা ধাপে তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবতার বিরোধ যখন পর্যবেক্ষণ থেকে প্রকট হয় তখন যুক্তি প্রয়োগ করে তত্ত্বকে পালটে উন্নততর তত্ত্ব তৈরী করা হয়। এটাই বিজ্ঞান। তত্ত্ব হয়ত কোনোদিনই পুরোপুরি বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করবে না, কিন্তু ক্রমশ একমুখীভাবে তা বেশী বেশী করে বাস্তবতার আভাস দিচ্ছে। এই বিজ্ঞান যুক্তিনির্ভর, বিষয়-মুখী ('অবজেক্টিভ'), বিষয়ীনিরপেক্ষ। অবশ্য কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান বলছে, বিষয়কে জানার জন্য বিষয়ীর ('সাবজেক্ট') যে প্রয়াস, চূড়ান্ড বিচারে তার কিছু মৌলিক সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু বিজ্ঞানের মূল বিষয়মুখী চরিত্র তাতে নাকচ হয় না। যুক্তিহীনতা নয়, যুক্তিই বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র। তত্ত্ব-পর্যবেক্ষণ-আরো উন্নত তত্ত্ব···· ····এই সিঁড়ি বেয়ে একনাগাড়ে ওপর উঠছে বিজ্ঞান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে চার দশক ধরে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি যে বিরাট দানবীয় চেহারা নিয়েছ, তার সঙ্গে অনেকেই বিজ্ঞানের এই মডেলটার যোগসূত্র স্বীকার করতে নারাজ। বিজ্ঞান একটা যুক্তি-নির্ভর, বিষয়মুখী, বিষয়ীনিরপেক্ষ ব্যাপার। আর বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অপপ্রয়োগ ত' একটা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার—মানুষের ভেতরকার পশুশক্তির প্রকাশ, অথবা শ্রেণীশোষণের অবশ্যম্ভাবী ফল। বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগকে বর্জন করতে হবে, বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে হবে। আর, বিজ্ঞানকে গ্রহণ করা মানেই ঐ মডেলটা গ্রহণ করা। অন্য কোনো গ্রহণযোগ্য মডেলই ত' নেই। এরকমই বলা হয়।

আসলে ভেবে দেখতে গেলে 'যুক্তিনির্ভর', 'বিষয়ীনিরপেক্ষ' কথা-গুলোর ভিতরই মারাত্মক সম্ভাবনার বীজ রয়েছে। কারণ বিষয়ীর—মানুষের—আবেগ, আশা-আকাঙ্খা, নানান ব্যাখাহীন সৃষ্টিছাড়া মানসিক চাহিদা, এ সবগুলোকে গোড়া থেকেই ব'লে-ক'য়ে বাদ দেওয়া হচ্ছে বিজ্ঞানের মডেল থেকে। নিরপেক্ষতা আর বিরোধিতার সীমারেখা আসলে খুব আবছা। একটা বিরাট মালটি-ন্যাশনাল সবসময় ইচ্ছা করে পাশের বস্তিতে থাকা মানুষগুলোর বিরোধিতা করতে যায় না। বস্তির মানুষদের ব্যাপারে মালটি-ন্যাশনাল সম্পূর্ণ উদাসীন—'নিরপেক্ষ'। কয়েক ঘন্টায় হাজার কয়েক বস্তিবাসীকে মেরে ফেলার পক্ষে কিন্তু ঐ উদাসীনতাটুকুই যথেষ্ট।

একটা কথা। বিজ্ঞানের ইতিহাস খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করলে অন্য ছবিও কিন্তু পাওয়া যায়। অর্থাৎ বিজ্ঞানের প্রচলিত মডেলটা ধোপে টেকে কিনা সন্দেহ দেখা দেয়। একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে টমাস কুন-এর নাম করছি। বিজ্ঞানের ইতিহাস বেশ গভীর ভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন। 'দি স্ট্রাকচার অভ সায়েন্টিফিক রেভলুশনস' নামক বহু-আলোচিত বইয়ের লেখক (প্রথম প্রকাশ 1962, পরবর্তী সংস্করণ 1970—দ্বিতীয়টিই বেশী উপযোগী, কারণ এতে একটি

অতিরিক্ত অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে)। এই বইয়ে কুন তাঁর বিখ্যাত 'প্যারাডাইম'-এর ধারণা হাজির করেছেন। নতুন এই কথাটিকে বুদ্ধিজীবী-সুলভ বাকচাতুরীর আর একটি নিদর্শন বলে উড়িয়ে দেওয়ার লোভটুকু যদি দমন করা যায় তবে ভাবনার খোরাক পাওয়া যাবে যথেষ্ট। অন্তত আমার তাই ধারণা। প্যারাডাইম কথাটার আভিধানিক অর্থ ছেড়ে আপাতত বাংলা করছি—কল্পচিত্র। কুনের মূল বক্তব্যের কিছু অংশ আমি যেভাবে বুঝেছি, একটু বলি।

বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রচলিত মডেলে প্রথম যে ব্যাপারটা অগ্রাহ্য করা হয় তা হ'ল, অভিজ্ঞতালব্ধ বা পরীক্ষালব্ধ পর্যবেক্ষণ আর তত্ত্বের ভিতরকার একটা ফাঁক, একটা অনিবার্য ব্যবধানের অস্তিত্ব। তত্ত্ব কখনো সরাসরি পর্যবেক্ষণের উপর দাঁড়িয়ে থাকে না, পর্যবেক্ষণের সঙ্গে তত্ত্বের সম্পর্ক বিকল্পবিহীনও নয়। শুধুমাত্র যুক্তির সাহায্যে পর্যবেক্ষণ থেকে বিকল্পবিহীন ভাবে একটা তত্ত্বে আসা যায় না। আইনস্টাইন তাঁর অনেক লেখায় এই বিকল্পের সম্ভাব্যতার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তবে তিনি বিষয়টিকে ধরেছিলেন দর্শন আর জ্ঞানতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে। আর কুন এসেছেন বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনার সূত্র ধরে। যুক্তি দিয়ে তত্ত্বকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তবে দেখা যাবে শেষ পর্যন্ত একটা জায়গায় গিয়ে যুক্তি থেমে যাচ্ছে—যুক্তির সীমানা পেরিয়ে তত্ত্বের শিকড় গিয়ে ঢুকেছে এমন জায়গায় যা অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও সম্পর্কটা বিশুদ্ধ যুক্তিনির্ভর নয়। আর ঠিক এখানেই এসে পড়ে এমন একগুচ্ছ উপাদানের কথা যেগুলি স্পষ্ট করে নির্দেশ করা খুব দুরূহ—ইংরাজিতে irrational বলা হয়ত একটু আপত্তি-জনক ঠেকবে, তবে extra-logical বলা যেতেই পারে। এই extra-logical কে বোঝা, বিশ্লেষণ করা, স্পষ্টতই, একটা অন্য ধরনের প্রয়াস। এর ভিতর যে কত স্তর রয়েছে, কত অচিন্তিত দিকে ছড়িয়ে পড়েছে তত্ত্বের শিকড় এই আলো-আঁধারীর মাঝ দিয়ে, কোন্ কোন্ অজানা জগৎ থেকে প্রাণরস সংগ্রহ করছে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, তার হদিশ করা বোধহয় দরকার। কুনের 'প্যারাডাইম', আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে একটা খুব প্রাথমিক প্রয়াস।

কুন শুরু করছেন একজন বিজ্ঞানের ছাত্র যে প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞান শেখে, সেখান থেকে। বিজ্ঞানের যে কোনো শাখাতেই হোক না কেন, পাঠ্যপুস্তকগুলো এক একটা জায়গায় অনেক বিষয়কে বিশ্লেষণ না করে অনেকটা অকথিত ভাবে কয়েকটা জিনিস ধরে নেয়। বিশ্লেষণের অভাবটা পূরণ করে দেয় দৃষ্টান্ত দিয়ে—যেন দৃষ্টান্তগুলোই সংজ্ঞা হিসেবে কাজ করছে ('প্যারাডাইম' কথার অভিধানিক অর্থ, দৃষ্টান্ত)। ছাত্রও নির্বিচারে মেনে নেয়, কারণ মেনে নিয়ে যে সব সিদ্ধান্ত টানা হয় তত্ত্ব থেকে, সেগুলো প্রয়োগের দিক দিয়ে খুবই সফল। এই যে কতকগুলো বিষয় অবিশ্লেষিত রেখে দেওয়া, মোটা দাগের কথায় বা শুধুমাত্র কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া, এ ব্যাপারটা সাধারণত খুব খুঁটিয়ে বিচার না করলে চোখে পড়ে না—বেশীর ভাগ সময়ই, 'সহজ বুদ্ধি'তে সায় মেলে, তাই এই প্রচ্ছন্ন স্বীকৃতিগুলো খুব একটা অস্বস্তির কারণ হয় না।

তবে এগুলো যে দৃঢ় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, আপাতসত্য মাত্র, সেটা সবচেয়ে ভাল বোঝা যায়, যখন খুব বেশী করে টানাপোড়েন পড়ে ঠিক ঐ দুর্বল জায়গাগুলোতে—আর অনেকসময়ই এই টানা-পোড়েন থেকে বিজ্ঞানের জগতে ঘটে যায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন। আগেকার পর্যায়ে যেটাকে 'সহজ বুদ্ধির' ব্যাপার বলে মনে হচ্ছিল পরে সেটাকেই মনে হয় চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা। এমনকি আগেকার পর্যায়ের বৈজ্ঞানিকদেরকে মনে হয় নির্বুদ্ধি, ছেলেমানুষ, গোঁড়া। দহনের ফ্লোজিস্টন তত্ত্ব বা তাপের ক্যালোরিক তত্ত্ব যে কি করে তখনকার বিজ্ঞানীদের সমর্থন পেয়েছে বুঝতে কষ্ট হয়।

বস্তুত, আপাতদৃষ্টিতে অসংগতিপূর্ণ ব্যাপার মনে হলেও এই কল্পচিত্রই কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় অগ্রগতির একটা অপরিহার্য সর্ত। কারণ এই কল্পচিত্রই একটা এলাকা স্থির করে দেয়, যে এলাকার ভিতর চলে নানান অনুসন্ধান, নানান সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা, বৈজ্ঞানিক যুক্তির প্রয়োগ। এবং এর মধ্যে দিয়ে সমৃদ্ধ হয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। যদিও আবার এই ভাবেই জমতে থাকে ছোটখাট অসংগতি, যা আগেকার তত্ত্ব দিয়ে কোনোভাবেই দূর করা যায় না; এবং শেষ পর্যন্ত অসঙ্গতিগুলো একটা সংকটের চেহারা নেয়। শেষ পর্যন্ত টান পড়ে আগেকার পর্যায়ের কল্পচিত্রেই—এলোমেলো নানান প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে আসে আর একটা তত্ত্ব যা আসলে আগেকার কল্পচিত্রের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করে আর একটা কল্পচিত্রকে।

বিজ্ঞানের কোনো বড় শাখায় একটা খুব উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব যখন আর একটা নতুন ও সফল তত্ত্বের মুখোমুখি হয় তখন সেই শাখার বিজ্ঞানীদের মনোভাব এই ব্যাপারটার ইঙ্গিত দেয়। কারণ অন্তর্বর্তীকালীন সময়টাতে দুটি তত্ত্বের কোনোটাই সব তথ্য ও পর্যবেক্ষণকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারে না। তখনই ক্রমশ সামনে আসে কল্পচিত্রের প্রসঙ্গ। তত্ত্ব কোন্ কোন্ পর্যবেক্ষণকে কতটা নিখুঁত ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছে, শুধুমাত্র এই বিচারকে তখন নিয়ামক ভূমিকা দিতে রাজী হন না বেশীর ভাগ বিজ্ঞানী, কারণ প্রশ্নটা তখন 'সহজ সত্য' নিয়ে, যা এতদিন ধরে বিশ্বস্ত ভাবে সেবা করা এসেছে তত্ত্বের (দেশ-কালকে যদি পরম বলে ধরা না যায় তা হলে আর বিজ্ঞানের কি রইল? অণু-পরমাণুর গতিবিধিতে মৌলিক অশ্চিয়তাই যদি থাকে তবে ত বিজ্ঞান ব্যাপারটাই অর্থহীন হয়ে যায়!)। অপরদিকে আনকোরা একটা কল্পচিত্রকে তখন সমর্থন করে যাচ্ছে জনাকয়েক জেদী তরুণ। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সাফল্যের পাল্লা অনেকটা ভারী হয়ে যায় নতুন তত্ত্বের দিকে—স্বকৃত পায় নতুন কল্পচিত্রটি। আর কল্পচিত্র স্বীকৃতি পেলে তবেই বাতিল হয় পুরনো তত্ত্ব।

একটা তত্ত্ব থেকে আর একটা তত্ত্বে উত্তরণের এই প্রক্রিয়ার নানান নজীর খুঁটিয়ে বিচার করেই কুন বক্তব্য রেখেছেন, বিজ্ঞানের বিকাশ ঠিক পর্যবেক্ষণ আর তত্ত্বের সরাসরি ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে ঘটে না—এখানে তৃতীয় একটি উপাদান আছেঃ সেই উপাদানটি হল কল্পচিত্র, প্যারাডাইম।

তত্ত্ব আর তথ্যের মাঝে যে extra-logical জায়গাটার উল্লেখ করেছি তারই একটি উপাদান হিসেবে কুন প্যারাডাইমের কথা বলেছেন। কুন খুব সতর্ক, যাতে বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে যথেষ্ট সাক্ষ্য হাজির করা যায়। তাই বেশী অনুমান-নির্ভর বা আলগা কথা বলতে চান নি। শুধু প্যারাডাইম নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর প্যারাডাইমের আলোচনার মধ্যে দিয়ে পরোক্ষভাবে হলেও আরো তাৎপর্যপূর্ণ যে বিষয়টিকে মজবুত সমর্থন যুগিয়েছেন কুন তা হ'ল, ঐ extra-logical জায়গাটার অস্তিত্ব। দর্শন ও জ্ঞানতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে যে ব্যাপারটা তুলে ধরেছিলেন আইনস্টাইন।

কুন যাকে প্যারাডাইম বলেছেন তা ছাড়াও বিজ্ঞানের এই অগোচর, নিগূঢ়, অন্তর্লীন অধ-স্তরের অন্যান্য উপাদানগুলো আলোচনার ও অনুসন্ধানের দাবী রাখে। এখানেই হয়ত পাওয়া যাবে বিজ্ঞানের প্রকৃত মানবিক শিকড়। নানান মানবিক ঈপ্সা-আবেগ,—ব্যক্তি গোষ্ঠী, শ্রেণী, জনমাসের একান্ত নিজস্ব, স্থান-কালনির্ভর নানান বৈশিষ্ট্যে সংপৃক্ত এই স্তর, এমনটা ভাবা হয়ত অনুমানের চেয়ে বেশী কিছু নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের স্বরূপ ও গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে এটা একটা ভেবে দেখার মত কল্পচিত্র, একটা নতুন 'প্যারাডাইম'। কুনই বলেছেন, বিজ্ঞানে প্যারাডাইমের ভূমিকা স্বীকার করাটা বস্তুত বিজ্ঞান সম্পর্কেই একটা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা করছে। গোড়ায় বিজ্ঞানের 'মডেল'-এর যে প্রসঙ্গ দিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম, তার প্রাসঙ্গিকতা এখানেই।

কল্পচিত্রের প্রাসঙ্গিকতা স্বীকার করে নিলে বিজ্ঞানের যুক্তি-নির্ভর, বিষয়ীনিরপেক্ষ ছবিটা অনেকটা পালটে যায়। বিষয়মুখীতা ব্যাপারটাও আর আগেকার তাৎপর্য বহন করে না। বিজ্ঞান ক্রমশ একমুখী ভাবে প্রাকৃতিক বাস্তবতার সঠিক, পূর্ণ উপলব্ধির দিকে এগিয়ে চলেছে, এই ধরনের চিন্তা ভালভাবে যাচাই করার প্রশ্ন এসে যায়। কারণ 'প্রাকৃতিক বাস্তবতা' আর বিজ্ঞানের এই আন্তঃ সম্পর্ক আসলে একটা অবিশ্লেষিত স্বীকৃতি, একটা বিশ্বাসের ব্যাপার। বিকল্প কি হতে পারে চিন্তা করা প্রয়োজন। বস্তুত প্রতিটি পর্যায়েই বিজ্ঞান যে সব প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামায়, যে সব তত্ত্ব গড়ে তুলতে চায়, যে ধরনের বিশ্লেষণপ্রকরণ গ্রহণ করে, তার পিছনে থাকে বহুসংখ্যক সাময়িক উপাদান, বিশেষত সেই পর্যায়ের প্রচলিত কল্পচিত্রগুলি। অর্থাৎ শুধু বিষয় নয়, বিষয়ীরও মৌলিক ছাপ পড়ে বিজ্ঞানের উপর। বিষয়ীর চিন্তা-চেতনা-সংস্কৃতি, ethos-এর আঁকা-বাঁকা পথ-পরিক্রমায় বিজ্ঞান হ'ল একটা পদ্ধতি যার সাহায্যে প্রতিটি পর্যায়ে সে তার অভিজ্ঞতার, অনুসন্ধানের, পরিমন্ডলকে একটা সুশৃংখল, সুবোধ্য রূপ দিতে চায়। এবং যে কল্পচিত্রগুলি, যে সব বিশ্লেষণপ্রকরণ সাময়িক ভাবে এই রূপ দিতে বেশী সহায়তা করে সেগুলি নিয়েই তখনকার মত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গঠিত হয়। অনেকটা সেই অন্ধকারে মাতালের চাবি খোঁজার মত ব্যাপার—যেখানে ল্যাম্প-পোস্টের আলো পড়েছে সেখানেই শুধু তন্ন তন্ন করে খোঁজ চলছে। ল্যাম্প-পোস্টের বদলে যদি ধরে নিই টর্চের আলো, তবে উপমাটা আর একটু ভাল হয়। এক জায়গায় খোঁজা হয়ে যাওয়ার পরের বার টর্চের আলো কোথায় গিয়ে পড়বে সেটা অনেক জটিল ব্যাপার।

তার মানে কিন্তু এই নয় যে বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলির পরম্পরা কোনোই তাৎপর্য বহন করে না। প্রতিটি তত্ত্বই সম্পূর্ণ সাময়িক একটা ব্যাপার, কোনোভাবেই তাকে আগের তত্ত্বের চাইতে উন্নত বলে ভাবা চলবে না—এ ধরনের relativism এটা নয়। তত্ত্বগুলির পরম্পরা একটা ক্রমবিকাশ নিশ্চই সূচীত করে, কিন্তু তার মানেই সেটা কোনো একটা goal-directed প্রক্রিয়া, ক্রমশ বেশী করে 'প্রাকৃতিক বাস্তবতার' কাছাকাছি যাওয়া, এমনটা নাও হতে পারে। কারণ সবসময়ই এমন অনেক বিকল্প তত্ত্বের সম্ভাবনা থাকছে, যার ভিত্তি সম্পূর্ণ অন্য এক কল্পচিত্র, এবং সেই কল্পচিত্রকে ভিত্তি করে 'প্রাকৃতিক বাস্তবতা'কে বোঝার সম্পূর্ণ অন্য এক পরম্পরা থাকতেই পারে। কুন একটা ভাল উপমা দিয়েছেন। জৈব বিবর্তন নিশ্চই একটা ক্রমবিকাশমান প্রক্রিয়া। যে কোনো একটি প্রাণীর তুলনায় বিবর্তনের পরের ধাপের প্রাণীটি 'আরো উপযুক্ত' একথা নিশ্চই বলা যায়। কিন্তু নির্দিষ্ট স্থান-কালের বাইরে 'উপযুক্ততা'র কোনো পরম মানদন্ড নেই। তাই বিবর্তন ক্রমবিকাশমান একটি প্রক্রিয়া হয়েও goal-directed নয়; এর গঠনটা পিরামিডের মত নয়, যা ক্রমশ একটা নির্দিষ্ট শীর্ষবিন্দুর দিকে এগিয়ে চলেছে। এর গঠন একটা গাছের মত, যা ক্রমশ ডালপালা বিস্তার করে চলেছে—গাছের একটা ডাল থেকে আজ যেদিকে একটা প্রশাখা বেরুলো, তার সঙ্গে অন্য একটা ডাল থেকে অন্য একদিকে সম্পূর্ণ অন্য দিকে আর একটা প্রশাখা বেরুনোর সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে ডাল বা প্রশাখা বলতে বিজ্ঞানের অভ্যন্তরীণ বিভাজন—যেমন ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি অথবা ক্লাসিকাল মেকানিক্স, কোয়ান্টাম মেকানিক্স—এরকম বোঝাতে চাইছি না: গোটা বিজ্ঞানেরই বিকল্প পথে এগুনোর সম্ভাবনা বোঝাতে চাইছি।

অর্থাৎ, মূল দুটো ব্যাপার—একটা হ'ল বিজ্ঞানে কল্পচিত্রের গুরুত্ব আর কল্পচিত্রের সূত্র ধরে সাময়িক, স্থানিক, মানবিক আবেগ-অনুভূতির বিশেষ ভূমিকা। আর দ্বিতীয়টা এরই সঙ্গে সম্পর্কিত—বিজ্ঞানের বিকল্প পথ-পদ্ধতি-চিন্তাধারার সম্ভাব্যতা। বিজ্ঞান অমোঘ গতিতে পরম প্রাকৃতিক সত্যের দিকে এগুচ্ছে, বিজ্ঞানের চিন্তাধারা একটা সার্বজনীন একীভূত মতাদর্শ, বিজ্ঞানে কোনো ধরনের pluralism চলতে পারে না—এই ধরনের ছবি শেষ পর্যন্ত গিয়ে আজকের পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান-প্রযুক্তির মডেলটাকেই বিজ্ঞানের একমাত্র বা চূড়ান্ত মডেল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবে। খুব বেশী হলে হয়ত মডেলটাকে একটু পরিশোধিত করা হবে এই বলে যে পাশ্চাত্ত্য সমাজের শ্রেণীশোষণ ব্যবস্থা বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে যে বিকৃতির জন্ম দিচ্ছে সেগুলোকে দূর করার প্রয়োজন আছে, কিন্তু বিজ্ঞান-প্রযুক্তির 'অভ্যন্তরীণ' বা 'নিজস্ব' গঠন একটা অন্য জিনিস। এই 'নিজস্ব' গঠন ব্যাপারটা কিন্তু একটা আলেয়া। 'সমাজতান্ত্রিক' দেশগুলোতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অ-মানবিক চেহারা

তার প্রমাণ। বিজ্ঞান সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর ভূমিকা শ্রেণীশোষণের প্রত্যক্ষ প্রভাবের তুলনায় আরো মৌলিক। যে দৃষ্টিভঙ্গীটা আবার জুড়ে রয়েছে মানুষের সার্বিক জীবনচেতনার সঙ্গে।

এ প্রসঙ্গে একটা উপমা তুলে ধরার লোভ সামলাতে পারছি না। বিজ্ঞানে তত্ত্ব, আর তত্ত্বের অধ-স্তর হিসেবে কল্পচিত্র, এই দুয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক—এটাকে আমার খুব বেশী করে তুলনীয় মনে হয় মানুষের চেতন এবং অবচেতনের সম্পর্কের সঙ্গে। অবচেতনের নিগূঢ় ক্রিয়া চেতনাকে কিভাবে প্রভাবিত করে আমরা সবসময় অবহিত থাকি না, তাই শুধু চেতনের সাহায্যে চেতনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নানারকম ভুল করি। অবশ্য যে কোনো ব্যাপারকেই এরকম উপরি-স্তর আর অধ-স্তরে ভাগ করতে যাওয়ার একটা বিপদ আছে—দুয়ের আন্ত সম্পর্ককে একমুখী ধরে নেওয়ার, অর্থাৎ অধ-স্তরকে উপরি-স্তরের নিয়ামক বলে ভাবার প্রবণতা এসে যায়। যেমন মার্কসবাদে 'ভিত্তি' আর 'উপরিকাঠামো'র বেলায় হয়েছে। কিন্তু এই reductionist ঝোঁকটা এড়াতে পারলে লাভবান হওয়া যায় অনেকটাই।

পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে বর্জন করা বা ঐ ধরনের বড় মাপের কোনো কথাই বলছি না। শুধু এটুকু বলছি, পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের মডেলটাই বিজ্ঞানের একমাত্র দৃষ্টিভঙ্গী কিনা ভেবে দেখতে। অথবা 'পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান' না বলে শুধু যদি বলা যায় বিজ্ঞানের বস্তুবাদিতা, প্রাকৃতিক বাস্তবতাকে তত্ত্বের রূপ দিয়ে প্রতিফলিত করার লক্ষ্য, তবুও এসব কথাকে বেশ খুঁটিয়ে যাচাই করতে। কারণ এইসব কথাগুলো খুব বৈজ্ঞানিক ধরনের শোনালেও সবই আসলে আজকের 'আধুনিক' বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত কল্পচিত্রের অংশ। যার প্রধান উৎস হল গত দুশ' বছর ধরে গড়ে ওঠা পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের মূল কথা হ'ল 'প্রকৃতিকে জানা'। এবং এই 'জানা'-র কাজে অন্য সব কিছুকে বলি দেওয়ার মানসিকতা গড়ে তুলেছে বিজ্ঞান।

যে কোনো জিনিসকেই যদি খুব বেশী মহান করে তোলা যায় তবে শেষ পর্যন্ত তার কাছে বলি পড়ে রক্তমাংসের মানুষ। আজকের বিজ্ঞানও এই 'প্রকৃতিকে জানা' ব্যাপারটাকে এত মহান করে তুলেছে যে তেজস্ক্রিয়তার গবেষণা করতে গিয়ে অকাতরে লিউকেমিয়ার শিকার হন বিজ্ঞানী দম্পতি। তার পরের ধাপেই আমলারা ঠাণ্ডা ঘরে বসে অন্যদেরকে তেজস্ক্রিয় ল্যাবরেটরী বা রিয়্যাক্টরের কাজে ঠেলে দেয়, দেওয়ালে টাঙানো থাকে বিজ্ঞানী দম্পতির ছবি। প্রকৃতিকে জানতে হবে—তাই 'অ্যাটম স্ম্যাসার', হয়তো নিছক বাই-প্রোডাক্ট হিসাবেই আসে 'অ্যাটম বম্ব'। বাই-প্রোডাক্ট যাই হোক, থামলে চলবে না, কারণ প্রকৃতিকে জানতে হবে। বিজ্ঞান যে বিষয়ী নিরপেক্ষ, যুক্তি নির্ভর, বাস্তবমুখী…

বিজ্ঞানের এই মডেলের বিকল্প হিসেবে আজ খুব বেশী দরকার অন্য এক কল্পচিত্র, অন্য 'প্যারাডাইম'। বিজ্ঞানের ইতিহাসই বলছে, এই বিকল্প খোঁজাটা অবৈজ্ঞানিক কিছু নয়।

With best Complim nts from :

S. MANDAL & CO.

MALIRIA,

PO. UTTAR RAMNAGAR

BURDWAN

'সবুজ বিপ্লব'-এর বাস্তবতা কতটা? ধান চাষের ক্ষেত্রে এই বিপ্লব অসাড়তা প্রকট হয়ে ওঠে ডাঃ রিচারিয়ার বক্তব্য, প্রতিবাদ, এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি থেকে ডাঃ রিচারিয়াকে অবশ্য তাঁর সরকারী পদমর্যদা হারাতে হয়েছে…

সবুজ বিপ্লব ঃ ধান চাষের একটি সমীক্ষা

ভূপাল দুর্ঘটনার স্মৃতি হয়ত ফিকে হয়ে আসবে, আমরা ভুলে যাবো। তবু ভূপালের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা এই দুর্ঘটনার জের টানবে বেশ কিছু বছর ধরে—হিরোসিমার এ্যাটম বোমা বিধ্বস্তদের মতন। আমাদের শস্য ও গাছপালা কার্বারিলের মত কীটনাশক দিয়ে বাঁচানোর দায়িত্ব নিয়েছে ইউনিয়ন কার্বাইডের মতন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী আর তাদের সমর্থকরা, যারা বলে 'সবুজ বিপ্লবের' জন্য এগুলো অপরিহার্য। আর এই সব রাসায়নিক যৌগের দায় বইছি আমরা, কখনো ভূপালের মতন বিস্ফোরিত দুর্ঘটনায় হাজার হাজার প্রাণ হারিয়ে, কখনো বা খুবই ধীরে ধীরে দিনের পর দিন ক্রমশঃ লাখে লাখে প্রাণশক্তি খুইয়ে। অথচ সত্যিই কি আমাদের দেশে 'সবুজ বিপ্লব' অর্থাৎ ধান, গম, জোয়ার এসব বেশী বেশী করে ফলানোর জন্য এই ধরনের কীটনাশক এবং উচ্চফলনশীল বীজ (H.Y.V) না হলেই নয়?

প্রশ্নটিকে আরো ক্ষুদ্র পরিসরে সীমিত করে ভারতের Central Rice Research Institute (CRRI)-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর ডঃ আর এইচ রিচারিয়ার অভিজ্ঞতা এবং বিশ্লেষণের আলোকে দেখা যাক ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লবের বাস্তবতা কতটা।

ভারতের মোট কৃষি খাদ্য উৎপাদনের 34% হ'ল ধান। 1978 সালের কিছু হিসাব একবার লক্ষ্য করা যাক। ঐ বছরে পৃথিবীতে প্রায় 14·5 কোটি হেক্টর জমিতে চাষ করে পাওয়া যায় 37·6 কোটি টন ধান। তার মধ্যে ভারতের 4 কোটি হেক্টর জমিতে চাষ করে পাওয়া যায় 5.2 কোটি টন ধান। অর্থাৎ বিশ্বের 27% জমিতে চাষ করে পাওয়া গেছে মাত্র 14% উৎপাদন। সারা পৃথিবীতে যেখানে হেক্টর প্রতি গড়পড়তা 2594 কিলোগ্রাম ধান উৎপন্ন হয় সেখানে ভারতে হয় মাত্র 1308 কি. গ্রা.। আর ভারতেরই ভিতরে আবার বিভিন্ন ধান উৎপাদন এলাকার মধ্যে ফলনের পার্থক্যও উল্লেখযোগ্য। আসাম, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং উত্তর প্রদেশে যেখানে হেক্টর প্রতি উৎপাদন কমবেশী 1000 কি. গ্রা. সেখানে পশ্চিমবঙ্গে 1387 কি. গ্রা., কর্ণাটকে 2082 কি. গ্রা., তামিলনাড়ুতে 2210 কি গ্রা., আর বিশ্বমান ডিঙ্গিয়েছে শুধু মাত্র হরিয়ানা, 2605 কি.গ্রা. এবং পাঞ্জাব, 3362 কিগ্রা.। অথচ ঐ সমস্ত রাজ্যে ফলন বাড়ানোর জন্য প্রায় এক দশক ধরে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশকের ঢালাও ব্যবহারের সুসংবদ্ধ প্রয়াস সত্ত্বেও, গবেষণাগার এবং নানান সংস্থার বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও, ফলন বিশ্বের মানদন্ডে আদৌ বাড়েনি। ঐ সময়েই কিন্তু মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশগড় এলাকায় ডঃ রিচারিয়া কীটনাশক এবং তথাকথিত উচ্চ ফলনশীল ধান (HYV) ব্যবহার না করে হাতে-কলমে স্থানীয় পদ্ধতিতে দেশজ বীজ অভিযোজনের (adaptation) মাধ্যমে এবং পরিমিত সার ব্যবহার করে আশানুরূপ উৎপাদন বাড়ানোর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

ছত্রিশগড় এলাকা বলতে বোঝায় দুর্গ, রাজনন্দনগাঁও, বস্তার, রায়পুর, বিলাসপুর, রায়গড় এবং সরগুজা, এই সাতটি জেলা। এই মালভূমি অঞ্চল অরণ্য এবং খনিজ সম্পদে ভরপুর হয়েও মধ্যপ্রদেশের 'ধানের গোলা' নামে পরিচিত। অবিশ্বাস্য সত্য এটাই, ছত্রিশগড় এলাকায় কমপক্ষে 19000-এর বেশী প্রজাতি ও উপ-প্রজাতির ধান প্রচলিত, যার কোনটি উচ্চফলনশীল, কোনটি সুগন্ধি, কোনটি বা সেদ্ধ হ'লে পরিমাণে বেশী ফোলে। এর ভিতর 1800'রও বেশী ধরনের প্রজাতির ধান (মোট সংখ্যার নয় শতাংশ) উচ্চ ফলনশীল। সাতপুরা আর বিন্ধ্যপর্বতের মাঝে এই অঞ্চলে ঘন বনাঞ্চল থাকায় বৃষ্টি হয় সারা বছরে 60 ইঞ্চি থেকে 75 ইঞ্চি। ইদানীং যথেচ্ছ ভাবে গাছ কেটে বন ধ্বংস করার ফলে আর বিশ্বব্যাংক প্রকল্প অনুযায়ী বৈদেশিক বাণিজ্যের স্বার্থে পাইন, ইউক্যালিপটাস, ধরনের গাছ চাষ করার ফলে ভূমিক্ষয় বাড়ছে, পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, বৃষ্টিপাত হয়ে উঠছে অনিয়মিত। ফলে চাষবাসে বৃষ্টির সহযোগিতা কমছে, সেচের প্রয়োজন বাড়ছে। অথচ ঐ এলাকায় মাত্র 8% কৃষি-জমি প্রধানতঃ খালের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার সুবিধা পাচ্ছে।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে সবুজ বিপ্লবের নামে ছত্রিশগড়ে উচ্চফলনশীল ধান ব্যবহার করে ফলন বাড়ানোর চেষ্টা শুরু হয়। তার ফলাফল হয় খুবই অস্থিতিশীল। নিচের তথ্যগুলো তার প্রমাণ।

জেলা	1970-71	71-72	72-73	73-74	74-75	গড়
দুর্গ	872	742	689	306	378	682
রাজানন্দগাও	—	—	689	860	413	854
বস্তার	762	866	679	920	706	786
রায়পুর	1273	978	950	954	568	944
বিলাসপুর	980	938	886	819	808	886
রায়গড়	845	773	649	1035	689	794
সরগুজা	715	909	538	750	495	681

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আসলে সবুজ বিপ্লবের কথাটা ফাঁকা আওয়াজ—সমস্ত পরিকল্পনাটাই বস্তুতপক্ষে ব্যর্থ। পাঞ্জাব এবং হরিয়ানাকে বাদ দিলে 16 টি রাজ্যেই এই ব্যর্থতা প্রকট। এবং উৎপাদন না বাড়ার কারণগুলো সব জায়গাতেই প্রায় একই—

(ক) জমি অসমভাবে বণ্টিত বলে একদিকে বিশাল জমির মালিকেরা ক্ষেতমজুরদের দিয়ে চাষ করায় আধিপত্য বজায় রাখার জন্য, এবং এরা নিবিড় চাষের মাধ্যমে ফলন বাড়ানোর চেষ্টা করে না ; অন্যদিকে উৎপাদনের জন্য তাদের সমস্ত প্রয়াস উজাড় করতে ক্ষেতমজুররা এগিয়ে আসে না, কেন না উৎপাদন বাড়লে ত' আসলে মালিকেরই লাভ।

(খ) ছোট চাষীরা সেচের সুযোগ-সুবিধা বড় একটা পায় না। এরা শ্যালো বা ডীপ টিউবওয়েল নিজেরা বসাতে পারে না। তাইচুঙ, আই আর এইট,জয়া, রত্না ইত্যাদি বীজ কিনে জমিতে রোপন করলেও দামী রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক কিনে ব্যবহার করার আর্থিক ক্ষমতা না থাকার জন্য জমি এবং শস্যের ক্ষতি হয় অবধারিত-ভাবে।

(গ) এক অঞ্চলের সংগে আরেক অঞ্চলের মাটির ধরন, জলের অবস্থান, বাতাসের আর্দ্রতা, আবহাওয়া এসবের প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। স্থানীয় কৃষিজীবীরা শতশত বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে কৃষিপ্রথা এবং শস্যের নানান উন্নতি ঘটিয়েছে। এই সব সনাতন ধান বংশানুক্রমে নির্দিষ্ট পরিবেশে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার এবং স্থানীয় রোগজীবাণুকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা অর্জন করেছে। তাদেরকে সরিয়ে যখন ঢালাও ভাবে সর্বক্ষেত্রে সব অবস্থাতেই নির্বিচারে HYV চাষের ফরমুলা সারাদেশে চালু হয়, বহিরাগত ধানবীজকে গবেষণাগারে পুষ্ট করে কৃষিজমিতে স্থান দেওয়া হয়, তখন এই বহিরাগত বীজগুলি কীটনাশক এবং রাসায়নিক সার ছাড়া বাড়তে পারে না এবং স্থানীয় পরিবেশ এবং অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে উঠতে পারে না বলেই কয়েক বছরের মধ্যেই ক্রমশঃ কর্ম-ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, এবং সহজেই রোগ-পোকায় আক্রান্ত হয়। এদিকে বারবার জমিতে যথেচ্ছভাবে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে জমিও সুস্থতা হারায়।

ম্যানিলার International Rice Research Institute (IRRI) ভারতে 1966 সালে HYV ধরনের খাটো জাতের ধানবীজের চাষ শুরু করায়। CRRI-এর তৎকালীন ডিরেক্টর ডঃ রিচারিয়া এ ধরনের প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে লিখিতভাবে প্রতিবাদ জানান। কিন্তু ওঁর আপত্তি টেকে না, এবং তার সঙ্গে CRRI-এর চাকরটিও যায়। পরবর্তীকালে মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সরকারের কৃষি উপদেষ্টা এবং রায়পুরে অবস্থিত Madhya Pradesh Rice Research Institute (MPRRI)-এর ডিরেক্টর হন। এই সুযোগে তিনি ও তাঁর সহকর্মীগণ ঐ রাজ্যে বিস্তৃত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে 17000-এর বেশী বিভিন্ন প্রজাতি, উপ-প্রজাতির ধানের germ plasm সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। ফল হলো কি, এই গবেষণালব্ধ germ plasm গুলি IRRI, ম্যানিলায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ডঃ রিচারিয়া এবং সঙ্গীরা চাকরী হারালেন, হারিয়ে গেলেন। ডিরেক্টর থাকা অবস্থায় যখন তিনি এ ধরনের গবেষণা চালাচ্ছিলেন তখনও অজস্র হয়রানি ও বাধার সামনে তাঁদের পড়তে হয়েছিল। তাঁর আবিষ্কৃত ধানচাষ প্রযুক্তি মাত্র অল্প সময়ের জন্য চালু রাখতে পেরেছিলেন ডঃ রিচারিয়া।

ঐ সময়ে 'মোকদো' নামে প্রচলিত ধান চাষ করে বস্তারের এক চাষী হেক্টর প্রতি 3700 থেকে 4700 কি.গ্রা. ধান ফলায় বেশ কয়েক বছর। রায়পুরের ধামতারি ব্লকের এক চাষী বেশ কয়েক বছর 'চিনার' জাতের ধান চাষ করে হেক্টর প্রতি কমবেশী 4400 কি.গ্রা. ধান ফলায়, F. Y. M.-এর সঙ্গে মাঝে মাঝে অল্প নাইট্রোজেন সার ব্যবহার ক'রে। বাস্তারের ফরাসগাঁও ব্লকের নাবাল জমিতে 'সুর্য' নামের মোটা এবং হাল্কা সুগন্ধি ধানের সঙ্গে 'জবা' নামে অধিক ফলনশীল ধান মিলিয়ে অল্প পরিমাণে সার ব্যবহার করে প্রচুর ধান ফলিয়েছিল একজন স্থানীয় চাষী। জগদলপুরের দহিকোঙ্গা গ্রামের বলদেও 1975 সালের নভেম্বর মাসে 'আসাম-চুড়ি' ধান কোনরকম কীটনাশক ছাড়াই শুধুমাত্র হেক্টর প্রতি 50 কি.গ্রা. নাইট্রোজেন ব্যবহার করে হেক্টর প্রতি 4000 কেজির বেশী ফলানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, সাধারণভাবে উবর্র ধানজমিতে কৃষি সার ছাড়াই লম্বা ধরনের দেশজ ধানগাছের অভিযোজিত (adapted) বীজের ফলন খাটো ধরনের HYV-এর ফলনের চেয়ে বেশী হয়, এবং হিসাবমত কৃষি সার উভয় ক্ষেত্রে ক্রমশঃ বাড়িয়ে গেলে দেখা যায় প্রতি কি.গ্রা. সার পিছু তুলনামূলক ভাবে দেশজ ধানবীজের ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ে বেশী। দেশজ প্রজাতির বেলায় ক্ষেত্রবিশেষে উৎপাদন আরো বাড়ানো যায়।

কীটনাশকের বেলায়ও দেখা গেছে, প্রচলিত দেশজ প্রজাতির বীজগুলিকে বাছাই পদ্ধতিতে উপযুক্ত ভাবে অভিযোজিত করে নিলে এগুলি অনেক অল্প কীটনাশক ব্যবহারে বেশী উৎপাদন দেয়।

এ ছাড়া, তুলনামূলক ভাবে অনুর্বর ক্ষেত্রে পরিমিত সার দিয়ে চাষ করলে দেখা যায়, সারের পরিমাণ যখন খুবই কম তখন দেশজ প্রজাতিগুলো ভালো সাড়া দেয়, কিলো প্রতি নির্দিষ্ট পরিমাণ সারে ধান হয় অপেক্ষাকৃত বেশী। তাই স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, রোগ এবং কীটের বিরুদ্ধে কার্যক্ষমতা, এই সমস্ত পরীক্ষা না করে HYV বীজ চালু করার বিরুদ্ধে ডঃ রিচারিয়া বারংবার অভিমত প্রকাশ করেছেন। HYV বীজের কতটা ক্ষমতা তা অন্ততঃ দশ বছর ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নেওয়ার পর চাষে চালু করতে বলেন তিনি। তাঁর আরো বক্তব্য, পুরাতনের বদলে নতুন এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু করার আগে স্থানীয় চাষ-আবাদ পদ্ধতির তত্ত্বগত ভিত্তি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুধাবন করতে হবে, বিচার করে দেখতে হবে নতুন ধরনের শস্যের সঙ্গে নতুন নতুন প্রযুক্তি বাস্তবিক ঐ সব স্থানীয় কৃষকদের আদৌ প্রয়োজন কি না। তবুও তাঁর মতামত অগ্রাহ্য করে HYV যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল সমস্ত জেলাতেই (একমাত্র রায়পুর জেলায় তিনি 70-71 থেকে অভিযোজিত দেশজ বীজ ব্যবহার করে চাষ করাতে পেরেছিলেন)।

এই প্রসঙ্গে জাপানের দিকে তাকানো যাক। জাপান 1975 সালেই হেক্টর প্রতি 6120 কি.গ্রা. উৎপাদন করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল। জাপানে বিভিন্ন ধরনের অভিযোজিত বীজ ধান অন্ততঃ দশ বছর ক্রমাগত পরীক্ষা–নিরীক্ষা করার পর চালু করা হয়। আর আমরা কোন কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই নিত্য নতুন বীজ ধান আর তার সঙ্গে কীটনাশক বাজারে ছেড়ে সনাতন দেশজ বীজ ধানের যোগান বন্ধ রেখে, ভাবছি তাতেই উৎপাদন ক্রমশ বেড়ে চলবে। ফলাফল: এই বহিরাগত HYV-দের প্রতিপালনের জন্য খরচ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এবং Law of Diminishing Return অনুযায়ী ফলন কমেই চলেছে।

সুতরাং, ভারতীয় পরিস্থিতিতে, (পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই বক্তব্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য) ধান উৎপাদনে 'সবুজ বিপ্লব' সফল করার জন্য প্রযুক্তির নতুন পদ্ধতি প্রয়োজন (ডঃ রিচারিয়ার ভাষায় Intermediate Technology-র আধুনিক ধারণা)। মোটের উপর বলা যায়—

(ক) এই প্রযুক্তি হবে স্থানীয় অবস্থা এবং পরিবেশের পক্ষে উপযোগী।

(খ) স্থানীয় কৃষকদের সংগতি ও বিনিয়োগের সাধ্যের ভিতর থাকবে।

(গ) খরচ কম হবে; নগদ টাকা বেশী লাগবে না।

(ঘ) জৈবসার ব্যবহার করা হবে, রাসায়নিক সার অবস্থা বুঝে খুবই অল্প পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে।

(ঙ) কীটনাশক ঔষধের বদলে প্রতিরোধক প্রাণী–শৃংখল গড়ে তুলতে হবে।

(চ) যে সব বীজ আদর্শ পরিস্থিতিতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন করে অথচ পরিবেশ বা চাষের ব্যবস্থার সামান্য হেরফের হলেই শস্য উৎপাদনে ব্যর্থ হয় সে ধরণের বীজ বর্জন করা দরকার। দেশজ বীজের ভিতর যেগুলো স্বাভাবিক প্রতিরোধক্ষমতাসম্পন্ন, পরিবেশর হেরফের হলেও যেগুলির উৎপাদনক্ষমতা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, এবং ছোট চাষীরা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেগুলিকে প্রয়োজনমত অভিযোজিত করে নিতে পারে, সেগুলিকেই গ্রহণ করা দরকার।

(ছ) বীজ ও চারা রোপনের সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করা, গাছের ডগা ও পাতা ঠিকমত ছেঁঠে ফেলা, গাছের দিকে সর্বদা নজর রাখা, ইত্যাদি আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাগুলিতে শ্রম ও যত্ন দিতে হবে।

(জ) ঠিকমত জলসরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ভূগর্ভস্থ জলের সঞ্চয়কে উপযুক্তভাবে কাজে লাগাতে হবে, এবং যথোপযুক্ত প্রযুক্তির মারফৎ সেচব্যবস্থা চালু করতে হবে, যাতে ছোট চাষীরা তার সদ্ব্যবহার করতে পারে। সেচব্যবস্থার সঙ্গে মৎস্যচাষ সংযুক্ত করা প্রয়োজন।

অর্থাৎ পুরোটাই একটা বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার। প্রচুর টাকা ঢেলে, HYV, সার, কীটনাশকের উপর নির্ভরশীল কৃষিব্যবস্থা গড়ার চেষ্টা অর্থহীন। সত্যিকারের সবুজ বিপ্লবের জন্য আজ হোক বা কাল হোক আমাদের উদ্যোগ নিতেই হবে। কারণ এ ছাড়া আর কোনো সহজ পথ নেই।

[বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় 10. 11 81 ও 11. 11· 81 তারিখে প্রকাশিত ভরত ডোগড়ার Stagnation in Rice Output (I এবং II) নিবন্ধ অনুসরণ করে লেখাটি তৈরী করেছে প্রদীপ দত্ত ও ধ্রুবজ্যোতি দে]

With best compliments from :

M/s CHATTERJEE UDYOG

KACHHARI PATTY,
BOLPUR
BIRBHUM

জনস্বাস্থ্য বনাম কীটনাশক

সুব্রত শীল

কিছুদিন আগের একটি ঘটনা। এক ফলবিক্রেতা চিৎকার করে বলছে, "এমন সুন্দর চকচকে লাল আপেল —কোন দাগ নেই, কোথাও পাবেন না, আসুন নিয়ে যান, প্রাণ ভরে খান, রোগকে দূরে রাখুন।" অনেক লোক এতে আকৃষ্ট হয়ে সেই আপেল কিনল এবং কালবিলম্ব না করে সুন্দর আপেলগুলি গলাধঃকরণ করল—খোসা পর্যন্ত ছাড়াল না। কিন্তু বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। শীঘ্রই তাদের প্রচন্ড পেট-ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে যেতে হ'ল। পরে জানা গেল যে, বিক্রেতা ফলকে সতেজ রাখার জন্য আগের দিন তাতে কোন বিষাক্ত কীটনাশক মিশিয়েছিল। তারই ফলশ্রুতি এই ঘটনা।

আজ থেকে পনেরো কুড়ি বছর আগেও গ্রামাঞ্চলে বৃষ্টির সময় থেকে শুরু করে ধান কাটা পর্যন্ত খালে-বিলে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। গ্রামীণ জনসংখ্যার একটা অংশ এই মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করতেন। আর আজ গ্রামের খালে-বিলে অত মাছ পাওয়া যায় না। শুধু মাছই বা বলি কেন, কাঁকড়া, শামুক, গুগ্‌লি প্রভৃতিও বিলুপ্তির পথে। ফলে গ্রামের লোকের খাদ্যতালিকা থেকে প্রোটিনের পরিমাণ খুব কমে গেছে। শুধু মাছ-কাঁকড়া নয়, গ্রামে আগে কত রকমের পাখী দেখা যেত; এখন আর তা দেখা যায় না। অনেক গ্রামেই এখন আর শেয়ালের ডাক শোনা যায় না। কারণ কি? অনেক কারণ আছে—যেমন নির্বিচারে প্রাণী হত্যা, পতিত জমির পরিমাণ হ্রাস ইত্যাদি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ বোধ হয়, গত পনেরো-কুড়ি বছরে আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে কীট-নাশকের ব্যাপক ব্যবহার। এই কীটনাশক বিষের সরাসরি "প্রতিক্রিয়ায় যেমন মাছ কাঁকড়া প্রভৃতি প্রজাতি মারা গেছে তেমনি বক, শেয়াল, মাছরাঙা ইত্যাদি যারা মাছ-কাঁকড়া ইত্যাদি খেয়ে বেঁচেবর্তে থাকত তারাও খাদ্যাভাবে মারা যাচ্ছে বা বিষযুক্ত মাছ-কাঁকড়া খেয়ে প্রজনন-ক্ষমতা হারিয়েছে, ফলে তাদের বংশলোপের আশংকা দেখা দিয়েছে। কারণ, ডি. ডি. টি., বি. এইচ. সি., এনড্রিন, এলড্রিন, ম্যালাথিয়ন ইত্যাদি কীটনাশকগুলো মাছ ও কাঁকড়ার শরীরে সঞ্চিত হয় এবং খাদ্য চক্রের মাধ্যমে অন্যান্য-পশুপাখীর দেহে গিয়ে জমে। এই সঞ্চয়ের মাত্রা একটা সীমা পেরোলেই নানারকম রোগে তারা আক্রান্ত হয় এবং তাদের মৃত্যু ঘটে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, উৎপাদনে দেশকে সমৃদ্ধ করার জন্য কীটনাশকের ব্যবহারে মাছ-কাঁড়া-বক-মাছরাঙা, শেয়াল মরলেও তাতে মানুষ বাঁচবে ত'?

সম্প্রতি লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে ইন্ডিয়ান ভেটেনারী রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কে এক রিপোর্ট পেশ করেছেন। রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন বাজার থেকে মাছ, মাংস, ডিম ও শাকসব্জীর যে নমুনা তাঁরা সংগ্রহ করেন সেগুলিতে 1 থেকে 8 পি. পি. এম (পি. পি. এম দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ) পর্যন্ত সঞ্চিত কীটনাশক বিষ পাওয়া গেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই বিষগুলির সহনীয় সীমা (অর্থাৎ যে সীমার বেশী হলে তা মানুষের দেহে নানারকমের উপসর্গ সৃষ্টি করবে) স্থির করেছেন 2-5 পি. পি. এম। অর্থাৎ এই রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষের মানুষ খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে সহনীয় সীমার তিনগুণ বেশী বিষ খেয়ে চলেছেন। ইনস্টিটিউটের মতে "আমরা যা কিছুই খাচ্ছি তার মধ্যে রয়েছে মানুষের জৈবিক ব্যবস্থার পক্ষে ক্ষতিকারক বিষাক্ত রাসায়নিক।"

বোম্বাই -এর Indian Institute of Science-এর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে মানুষের নিত্য আহার্য 137টি সবজীর মধ্যে প্রায় 63টিই কীটনাশক-দূষিত। টিনজাত বিভিন্ন ব্র্যান্ডের দুধে ডি. ডি. টি-র আশংকাজনক উপস্থিতি দেখা গেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর মনুষ্য সহ্য-সীমা 1 পি. পি. এম বলে ঘোষণা করেছেন। এই প্রসঙ্গে বলি, মহারাষ্ট্রে একবার কিছু পরিমাণ আলুতে 4.2 পি. পি. এম ডি. ডি. টি পাওয়া যায়। বোম্বের শহরতলী বান্দ্রা থেকে সরবরাহ-কৃত দুধ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তাতে প্রায় 4.8 পি. পি. এম থেকে 6.? পি. পি. এম ডি. ডি. টি রয়েছে। ডি. ডি. টি. ও অন্যান্য সব কীটনাশক খাদ্য (সবজী, দুধ, মাছ-কাঁকড়া)-বাহিত হয়ে সহজেই মানুষের শরীরে প্রবেশ করে ও রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। ফলে নানারকম ক্ষতিকারক উপসর্গের সৃষ্টি করতে পারে, এমনকি ক্যান্সারেরও জন্ম দিতে পারে। জানা গেছে যে, ডি. ডি. টি. মানুষের ফ্যাটি কোষে প্রবেশ করে, ডিম্ব-কোষের প্রাচীরকে পাতলা করে দেয় এবং এর ফলে নির্ধারিত সময়ের আগেই কম ওজনের শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। কখনও কখনও বিকৃত নবজাতকও জন্মায়। এও জানা গেছে যে, কীটনাশকের বিষে লিউকোমিয়া, স্নায়বিক রোগ, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস, পক্ষাঘাত, অজীর্ণ ও ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদিও হ'তে পারে। মশার ডিম বা শূককীট খেয়ে নেয় যেসব জলজ প্রাণী, কীটনাশকের প্রভাবে সেগুলি কমে যাওয়ায় মশা ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেড়ে গেছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কীটনাশকের বিষে শুধুমাত্র মাছ, কাঁকড়া, বক, মাছরাঙা, শেয়ালই নয়, মানুষও বিপন্ন। এ প্রসঙ্গে ভূপালের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা নিশ্চয়ই একটা ভাল উদাহরণ। ভূপালে বহুবিধ কীটনাশকের অন্যতম উপাদান "সেভিন" নামে এক জৈব পদার্থ প্রস্তুতিতে মিথাইল-আইসো-সায়ানেট (MIC বা মিক)-এর প্রয়োজন হয়। কীটের স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করে কীটকে ধ্বংস করাই মিক থেকে প্রস্তুত কীটনাশকের কাজ। মানুষ মিক-এর সংস্পর্শে এলে প্রথমেই তার চোখের জল পড়া শুরু হয় এবং তার পরেই চোখের অচ্ছোদ পটল (cornea) ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ধীরে ধীরে অস্বচ্ছ (opaque) হয়ে যায়। শ্বাসের সঙ্গে মিক দেহে প্রবেশ করলে শ্বাসনালীর বিভিন্ন অংশ (larynx, bronchial passage, nasal passage) তৎক্ষনাৎ সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং সাংঘাতিক শ্বাসকষ্ট হয়। শ্বাসনালীর বিভিন্ন স্নায়ুপ্রান্তগুলিকে মিক অকেজো করে দেয়। ফলে এই শ্বাসকষ্ট। মিক ফুসফুস, যকৃৎ ও বৃক্কের ক্ষতিসাধন করে, পরিমাণে বেশী হলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে। ভূপালের দুর্ঘটনা এই "মিক"-এর জন্যই। ভূপালে যে কয়েক হাজার নিরপরাধ মানুষ মারা গেছে তারা আর ফিরে আসবে না। যে লক্ষাধিক মানুষ কঠিন ও জটিল রোগে আক্রান্ত হয়েছেন তারা কখনও পূর্বস্বাস্থ্য ফিরে পাবেন না।

কয়েক বছর আগে দিল্লী সদর বাজারের একটি ঘটনা। রাত্রে তিনটি শিশুর বিছানায় কোন কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়েছিল। এতে কীটেরা খতম হবে এই আশা নিয়ে তারা শীঘ্রই বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু হায়, কেউই আর জাগল না। সারা রাত্রি খোলা গায়ে কীটনাশকের বিষের সংস্পর্শে থাকায় তাদের মৃত্যু হয়েছিল। যেহেতু মৃত্যুটা ছিল তাৎক্ষনিক এবং অভূতপূর্ব, তাই ঘটনাটা জনসমক্ষে-প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু এমন অনেক ঘটনাই আছে যেগুলি আরও মর্মান্তিক—দীর্ঘদিন ধরে কীটনাশকের বিষে ধীরে ধীরে মানসিক এবং শারীরিক রোগে আক্রান্ত হয়ে এবং আত্মীয়স্বজনকে দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে ক্রমশঃ অবশ্যাম্ভাবী মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়া।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা প্রয়োজন বলে মনে করছি। সাধারণতঃ মাটিতে কেঁচো প্রভৃতি প্রাণী জমির উর্বরতা বাড়ায়। তাছাড়া জমিতে রয়েছে হাজার হাজার ব্যাকটেরিয়া যারা নানাভাবে জমিকে উর্বর করে। সমজীবী ব্যাকটেরিয়া বাতাস থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন টেনে নিয়ে তাকে নাইট্রোজেনঘটিত লবণে রূপান্তরিত করে। কিন্তু কীটনাশক করছে কি? এই সমস্ত ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করছে। এতে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের অভাবে মানুষ প্রোটীন, শর্করা বা স্নেহ-জাতীয় খাদ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

কলকাতার অবস্থা

কলকাতার বাজারে বিক্রিত খাদ্যদ্রব্যও কিন্তু এই কীটনাশকের বিষ থেকে মুক্ত নয়। এখানে বিভিন্ন নমুনা নিয়ে সেন্ট্রাল ফুড ল্যাবরেটারী যে সমীক্ষা চালিয়েছেন তাতে সবরকম খাদ্যদ্রব্যেই বিপজ্জনক মাত্রায় কীটনাশকের উপস্থিতি দেখা গেছে।

স্বাস্থ্যের ক্ষতিকারক কীটনাশক

কীটনাশকের বিষাক্ত ক্রিয়া সাধারণতঃ দু'রকমের। একটি তাৎক্ষণিক ও ভয়ংকর ধরনের, অন্যটি দীর্ঘসময়ব্যাপী। প্রথমটির জন্য দায়ী উচ্চমাত্রায় বিষাক্ত রাসায়নিক, যেমন প্যারাথিয়ন বা ম্যালাথিয়ন, যেগুলি মানুষকে অক্ষম করে তোলে। দ্বিতীয়টির জন্য দায়ী কীটনাশকগুলি সাধারণত দীর্ঘদিন ধরে শরীরের সংস্পর্শে বিষাক্ত রাসায়নিক জমিয়ে রাখে যেগুলিকে মানুষের শরীর সহজে ভাঙ্গতে পারে না এবং শীঘ্র নির্গত করতে পারে না। ডি. ডি. টি, ক্লোরোডাইন, লিনডেন ইত্যাদি এর উদাহরণ।

কিভাবে ব্যবহার করেন?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোন ধরনের কীটনাশক ব্যবহার করা নিরাপদ? এবং কিভাবে? বাড়ীতে নিরাপদ ব্যবহারের জন্য ম্যালাথিয়ন অপেক্ষাকৃত কম বিপজ্জনক। ডি.ডি.টি., লিনডেন বা অন্যান্য ধরনের কীটনাশকগুলিও বাড়ীতে প্রয়োগ করা যায় তবে প্রথমতঃ এগুলিকে সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে এবং দ্বিতীয়তঃ কীটকে কীটনাশকের প্রতি প্রতিরোধক হওয়া চলবে না। ডি. ডি. টি. হচ্ছে এর উদাহরণ। কারণ, এটি একসময় মনুষ্য প্রজাতির সেবায় নিয়োজিত হয়েছিল। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় এটা ঘোষণা করা হয়েছিল যে সৈন্যরা এই রাসায়নিক দ্বারা মারাত্মক রোগের আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন। ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বনগুলি বিভিন্ন কীটকে আশ্চর্যজনকভাবে দ্রুত নির্মূল করে দেয়। যেমন ধরুন, গ্যামাক্সিন, ক্লোরোডাইন, এবং অন্যান্যরা। তা সত্ত্বেও মানুষ আজও সেই একই কীটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। কেননা নতুন প্রজাতি কীটনাশকের প্রতি এক অদ্ভুত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে—যেমন ধরুন, ডি. ডি. টি.। আরশোলার বর্তমান প্রজাতি এই সর্বজনীন নাশকের প্রতি সম্পূর্ণ প্রতিরোধক বলে জানা গেছে।

বাড়ীতে যদিও তুলনামূলক ভাবে কম বিষাক্ত এবং কম ঘনত্বের কীটনাশক ব্যবহার করা হয় তথাপি বারংবার সংস্পর্শে আসার দরুন ভয়ংকরতা কম নয়। বিশেষ করে ডি. ডি. টি., লিনডেন এবং এই জাতীয় অন্যান্য সংযোজক কীটনাশক বিষের দীর্ঘস্থায়ী সংস্পর্শ। এজন্য প্রয়োজন বাজারে যে সমস্ত কীটনাশক পাওয়া যায় তাদের নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের অভিমত নেওয়া। যে সমস্ত কীটনাশক অপেক্ষাকৃত কম বিষাক্ত কিন্তু সহজে কীটনাশ করে সেগুলিই ব্যবহার করা উচিৎ। তাতে যদি কাজ হয় তা' ভাল, নতুবা বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। সতর্কতা না নিয়ে বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করলে অনেক সময় মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে।

কীটনাশক যদি তরল হয়, তবে আধারের ঢাকনা খোলার সময় মুখ, চোখ বা নাক যতটা সম্ভব দূরে রাখা উচিৎ। কোনো কারণে যদি কীটনাশক চোখে চলে যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ জল দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলা উচিৎ এবং তারপর প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ করা উচিৎ। কীটনাশক স্প্রে বা ব্যবহার করার সময় ধূমপান, খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ মোটেই উচিৎ নয়। ব্যবহার করার

পর গা, হাত, পা ভাল করে সাবান ও জল দিয়ে ধুয়ে ফেলা উচিৎ, যদি পারা যায় স্নান করে পরিষ্কার হয়ে পরিষ্কার জামাকাপড় পরা উচিৎ। তারপর খাওয়া দাওয়া বা পান করা উচিৎ। ব্যবহার করা জামাকাপড় লন্ড্রীতে ধুয়ে ফেলা উচিৎ।

কীটনাশক ব্যবহার করার সময় শিশু ও গৃহপালিত জন্তুদের দূরে রাখুন। শিশুর নার্সারীতে শুধু এমন ধরনেরই কীটনাশক ব্যবহার করা উচিৎ যার পরে কোনো বিষক্রিয়া থাকে না ; আর কীটনাশক ব্যবহারের আগে অবশ্যই শিশুকে কয়েক দিনের জন্য সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ঠিক একইরকম ভাবে রান্নাঘর বা খাবারঘরে এমন কীটনাশক ব্যবহার করা উচিৎ যার কোন দীর্ঘস্থায়ী বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া থাকবে না। ব্যবহার করার আগে সমস্ত রকমের খাদ্য নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রাখতে হবে যাতে কীটনাশকের বিষ দ্বারা দূষিত না হয়। বাড়ীর দেওয়ালে, ছাদে বা মেঝেতে কীটনাশক কখনই স্প্রে করা উচিৎ নয়, কারণ সেখান থেকে বিষকে সহজে দূর করা যায় না—ফলে শিশু, গৃহপালিত জন্তু, এমনকি বড়রাও এর সংস্পর্শে বারংবার আসেন।

ইণ্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গৃহে ব্যবহৃত সবচেয়ে নিরাপদ ও সর্বাপেক্ষা কার্যকরী কীটনাশক হচ্ছে পাইরেথ্রিনস (Pyrethrins)—যেটি পাইরেথ্রাম Pyrethrum পাউডারের মূল উপাদান, বা অ্যালারথ্রিন (Allerthrin)—যেটি পাইরেথ্রাম থেকেই তৈরী করা হয়। তবে বাজারে যে সমস্ত কীটনাশক পাওয়া যায় সেগুলির বেশীর ভাগেই এই পাইরেথ্রিনস থাকে না। কারণটা খুবই স্বাভাবিক। পাইরেথ্রাম বেশ দামী, এবং যেটুকু ব্যবহারের জন্য পাওয়া যায় তার বেশীর ভাগই খাদ্য-সংরক্ষণের কাজে লাগে। তাছাড়া পাইরেথ্রিনসের কার্যকারীতাও দীর্ঘস্থায়ী নয়।

তবে ভারত সরকার বাড়ীতে ব্যবহারের জন্য কেন্দ্রীয় কীটনাশক আইন অনুযায়ী অনুমোদিত কার্যকরী এবং স্বল্প বিষাক্ত কীটনাশকের একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন। এই নির্দেশনামা অনুযায়ী কেরোসিনে 0.2% পাইরেথ্রিন বা 0.5%অ্যালারথ্রিন বা 2.0%ম্যালাথিয়ন বা 0.1%লিনডেন একক কীটনাশক হিসাবে অনুমোদিত। তা ছাড়াও নিম্নলিখিত পাইরেথ্রিন ও অন্য আরেকটি নির্দিষ্ট কোনো উপাদানসহ কেরোসিনের দ্রবণ কীটনাশক হিসাবে অনুমোদিত :

1.	পাইরেথ্রিনস	0.5%	
	সিনারজিস্ট	0.1%	
	(কার্যকারীতা বৃদ্ধি করে)		
2.	পাইরেথ্রিনস	0·05%	(ফিনিট, শেলটক্স)
	ম্যালাথিয়ন	1.0%	
3.	পাইরেথ্রিনস	0·05%	
	লিনডেন	0.05%	
4.	পাইরেথ্রিনস	0.02%	
	সিনারজিস্ট	0.5%	(পেস্টসীল, অ্যারোসোল)
	ম্যালাথিয়ন	0.05%	
5.	পাইরেথ্রিনস	0.02%	
	লিনডেন	0.02%	(পেস্টসীল)
	সিনারজিস্ট	0.5%	

এছাড়াও আরও বিষাক্ত কীটনাশক তালিকায় রয়েছে, যেগুলি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট স্থানে প্রয়োগ করা যায়। এগুলির মধ্যে রয়েছে কেরোসিনে ম্যালাথিয়নের 5%দ্রবণ, মিশ্রিত ফেনিট্রোথায়নের 2%দ্রবণ (টিক 20), প্রোপোক্সারের 2·0%দ্রবণ (বেগন), লিনডেনের 0.5% দ্রবণ (টারমেক্স) বা ক্লোরডেনের 3·0% দ্রবণ (কোবান) ইত্যাদি। এছাড়া অনান্য সমস্ত কীটনাশক ঘরে ব্যবহারের জন্য নিষিদ্ধ।

এছাড়াও কৃষিক্ষেত্রে অজস্র কীটনাশক ব্যবহৃত হচ্ছে—যার অধিকাংশই আজ পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের দেশে বহুজাতিক কোম্পানীর "অকেজো প্রযুক্তি রপ্তানীর" পদ্ধতি অনুযায়ী সেগুলি এখনও চলছে। জীবাণু-উদ্ভিদ-প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় প্রকৃতিতে যে ভারসাম্য রয়েছে—কীটনাশকের অবৈজ্ঞানিক ও অপরিমিত ব্যবহারে তা নষ্ট হয়ে হয়ে যাচ্ছে। ফলে প্রকৃতির ছন্দ হারিয়ে যাচ্ছে এবং বিশৃংখল পরিবেশ জীবনধারণের পক্ষে ভীষণভাবে প্রতিকূল হয়ে উঠছে।

প্রতিকার কি ?

(1) কার্যকরী, স্বল্প-বিষাক্ত কীটনাশক ব্যবহার করা উচিৎ।

(2) কীটনাশকের ব্যবহার যতটা সম্ভব কমিয়ে জলসেচ, জৈব সার, গোবর, আবর্জনা ইত্যাদি ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা উচিৎ।

With best compliments of :

JANATA CONSTRUCTION CO.

COLLEGE ROAD, BOLPUR

BIRBHUM

মানবকল্যাণে অরণ্য পরিবেশ ও বন্য প্রাণী

আজকের যুগে কবির সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলা সম্ভব নয়—'দাও ফিরে সে অরণ্য' কিন্তু একথাও সত্য যে, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রগতির প্রয়োজনেই আরণ্য পরিবেশকে বাঁচিয়ে রাখা জরুরী হয়ে পড়েছে। মানব সমাজ, সভ্যতা ও পরিবেশ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল এই কথা ভুলে গিয়ে কিছু অজ্ঞ এবং মুনাফালোভী মানুষ সর্বত্র পরিবেশকে কলুষিত করছে, প্রাচীন অরণ্যকে ধ্বংস করছে। ফলে সমস্ত পৃথিবীতে আজ প্রায় এক হাজার দুষ্প্রাপ্য প্রাণী এবং পঁচিশ হাজার উদ্ভিদ প্রজাতি অবলুপ্তির মুখে। এমন অনেক গাছপালা ও প্রাণী রয়েছে যাদের আজও নামকরণই হয়নি।

নিজেদের ভবিষ্যতকে নিরাপদ করবার জন্যই পরিবেশকে কলুষমুক্ত রাখায় আমাদের উৎসাহী হওয়া প্রয়োজন। নতুন অভয়ারণ্য সৃষ্টি, বন সংরক্ষণ এবং পার্ক সংরক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে একাজ এগিয়ে নেওয়া সম্ভব।

পরিবেশ সংরক্ষণে নিষ্ঠার সঙ্গে অগ্রসর হলে সামান্য সময়ের ব্যবধানেই আমরা আমাদের প্রচেষ্টার পুরস্কার পেয়ে যাবো।

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

৮৪৭ তথ্য/এ

পরিক্রমা

বেকারদের স্বার্থে MX মিসাইল

অস্ত্র সীমিতকরণের প্রসঙ্গে দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে প্যাঁচ কষাকষি চলছে। সবাই জানে সেকথা। সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের তরফে একটি ঘোষণা করা হয়েছে। বেজায় হৈ চৈ পড়ে গেছে তাতে। তারা জানিয়েছে, সদিচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ ইউরোপের সীমান্ত বরাবর মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র বসানোর কাজ সাময়িক-ভাবে স্থগিত রাখতে রাজি তাঁরা। সকলে আগ্রহ সহকারে অপেক্ষা করে ছিলো প্রত্যুত্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফে কোন চমকপ্রদ ঘোষণা হয় কিনা। হতাশ হতে হয়েছে। এখনও পর্যন্ত তেমন কোন আশ্বাস মেলেনি। ইউরোপের দেশে দেশে পার্শিং 20 এবং ক্রুইজ মিসাইল বসানোর কাজ যথারীতি চলছে।

এই সময়ে মার্কিন সেনেটে MX-এর জন্য বাড়তি দেড় বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ বৃদ্ধির অনুমোদন চেয়ে আলোচনা চল-ছিল। সোভিয়েত ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো সেনেটর সম্ভবতঃ এর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। উত্তরে রেগন-পন্থীরদের তরফে জানানো হয়—মাননীয় সদস্যের এই ধরনের বিরোধিতা করা ঠিক নয়। MX-এর বিরুদ্ধে ভোটের অর্থ, যারা এর কন্ট্রাক্ট পেয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ভোট। আর তাদের বিরুদ্ধে ভোট মানে, দেশের চাকুরীপ্রার্থী বেকারদের বিরুদ্ধে ভোট। অতএব মাননীয় সদস্য যদি দেশের ছেলেদের চাকুরীর সুযোগ স্তব্ধ করে দিতে না চান তো এই সমরাস্ত্র তৈরীর কাজে বাধা সৃষ্টি করবেন না।

গৃহিনীদের জন্য সুখবর

সম্প্রতি একটি জাপানী ইলেকট্রনিক কোম্পানী জানিয়েছে, খুব শিগ্‌গির তারা যন্ত্র-মানব (রোবট) বাজারে ছাড়বেন মহিলাদের গৃহস্থালীর কাজে সহায়তা করার জন্য। রেডিও-টিভি খোলা-বন্ধ করা, জানালার পর্দা খোলা, কুকিং রেঞ্জ খোলা -বন্ধ করা, বাড়ীতে কেউ না থাকলে বাড়ী পাহারা দেওয়া, ইত্যাদি টুকিটাকি কাজ সেই রোবট করে দেবে। স্বভাবতঃ-ই মহিলারা খুশি।

তবে বিপদও আছে। মনে পড়ে গেল একটি গল্প। বেশ কিছুদিন আগে কোন একটি পত্রিকায় দেখেছিলাম।

তিনজনের এক পরিবারের খিদমত খাটবার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল এমন একটি যন্ত্র-দাস। সবাই তার কাজে খুশি। কিন্তু একদিন সে কাজে অবাধ্য হল। বড়দিন উপলক্ষ্যে বাড়ীতে কেক এসেছে। গোল কেক। গিন্নী রোবটকে হুকুম করলো কেকটিকে সমান তিন ভাগে ভাগ করে দিতে। সে অস্বীকার :করে বসল। সবাই অবাক। জিজ্ঞাসা করল—কেন এমন করছে। সে জানালো—'বোকার মত নির্দেশ দিও না। দেখছ না, ওটা গোল। সার্কেলের হিসেবে একটি সংখ্যা আছে, পাই। হিসেবটা নিখুঁত করা যাবে কি ?'

আর একটি দিনের ঘটনা। ভদ্রলোকের স্ত্রী বাপের বাড়ী গেলেন কিছুদিনের জন্য। ভদ্রলোককে রেখে গেলেন রোবটের

তদারকিতে। ভদ্রলোকের লম্বা লম্বা চুল। স্ত্রীর আবদারে চুল কাটতে পারেন না। ভাবলেন সে নেই, চুল ছেঁটে ক'দিন স্বস্তিতে কাটাবেন। চুল ছেঁটে এলেন। বাড়ী ঢুকতে যাবেন—বাধা পেলেন রোবটের কাছে। কেমন অপরিচিতের মত ব্যবহার করছে সে। ভদ্রলোক অনেক অনুনয় বিনয় করলেন এবং পরে জবরদস্তি ঘরে ঢুকতে গেলেন। রোবটের শক্তি বেশি। গলা ধাক্কা দিয়ে তাঁকে বের করে দরজা বন্ধ করে দিল। ভদ্রলোক ভাবতে লাগালেন—হল কি? হঠাৎ খেয়াল হল—তাইতো! চুল ছেঁটে এসেছি। বুঝলেন, তখনি আর ঘরে ঢোকার আশা নেই। যত দিন না চুল আগের মাপে হচ্ছে। ভদ্রলোক বেরিয়ে পড়লেন অন্য কোন সাময়িক আস্তানার খোঁজে।

টি-ভি খোলা বন্ধ করা, কাপ ডিশ ধোয়া, এই সব কাজ থেকে স্বামীরা এবারে বেকার হয়ে গেল। মাঝে মধ্যে গলাধাক্কাও খেতে হচ্ছে রোবটের কাছে। যন্ত্র-দাসেদের সঙ্গে স্বামীদের এই অসুস্থ প্রতিযোগিতার শেষ কোথায়··· ?

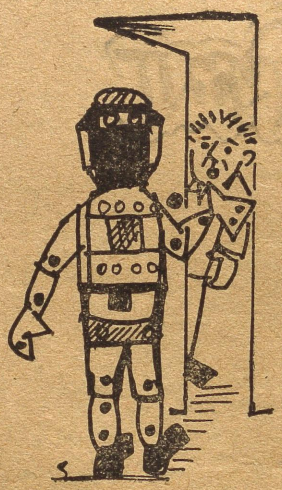

জডিস : ১৯৮৫

স্টাফ রিপোর্টার : রবিবার খিদিরপুর-গার্ডেনরিচ-মেটিয়াবুরুজ অঞ্চল ঘুরে দেখা গেল স্থানীয় বহু মানুষ "ডাক্তারদের পরামর্শেই" জণ্ডিস বা হেপাটাইটিস সারানোর জন্য এলোপ্যাথি কোন ওষুধ না খেয়ে "মায়ের ওষুধের" ওপরই ভরসা করে আছেন। বর্তমান

"দেশের অগ্রগতি অব্যহত"—প্রধানমন্ত্রী, "রঙীন টি. ভি, কম্পিউটার, অত্যাধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা, প্রযুক্তি, আকাশে ইন্‌স্যাট্‌ এ্যাপ্‌ল"·····

ডেনমার্কের সিদ্ধান্ত
Stop Nuclear Power

"Nuclear power stopped in Denmark.

On March 29, the Canish Parliament voted to approve the following ; the Parliament directs the government to adjust the official energy Planning for the Condition that nuclear Powers will not be used. The government shall therefore inform the electrical utilities that they will not receive approval for application for prmission to construct nuclear power plants'....."

বিগত মার্চ মাসে ডেনমার্কের পার্লামেণ্ট এক ঐতিহাসিক সিদ্ধাণ্তে পরমানুশক্তি নিষিদ্ধ করেছে। ফলে 1973 সাল থেকে সেদেশে পরমানুশক্তি ব্যবহারের যে নীতি ও প্রয়াস গৃহীত হয়েছিল তা কার্যত রদ হল। ডেনমার্কের প্রধান নিউক্লিয়ার বিরোধী সংগঠন OOA (Organisation for Information About Atomic Power) পার্লামেণ্টের এই সিদ্ধান্তকে এক ঐতিহাসিক বিজয় আখ্যা দিয়ে WISE (World Information Service on Energy)—কে এক দীর্ঘ টেলেক্স পাঠিয়েছে। বি-ও-বি-র সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শ্রীসৌমেন গুহ সম্প্রতি ডেনমার্ক থেকে এই টেলেক্সের একটি কপি পাঠিয়েছেন। ওপরে পার্লামেণ্টের সিদ্ধান্তের মূল রয়ানটুকু ইংরেজীতে দেখেছেন এবং পূর্ণাঙ্গ টেলেক্স-বার্তার সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ নীচে দেওয়া হল।

ডেনমার্কে পরমানু শক্তি নিষিদ্ধ

"29শে মার্চ (1985) ড্যানিশ পার্লামেণ্টে ভোটাভুটিত গৃহীত সিদ্ধান্তটি নিম্নরূপ : "পার্লামেণ্ট এই মর্মে সরকারকে নির্দেশ দিচ্ছে যে সরকারী শক্তি নীতি এমনভাবে ঢেলে সাজানো হোক যাতে পরমানুশক্তির ব্যবহার বন্ধ হয়। অতএব সরকার বিদুৎ (উৎপাদন) মন্ত্রককে এই মর্মে নির্দেশ দিন যে পরমানুশক্তি উৎপাদনের কোন প্রকল্পই অনুমোদন পাবে না"।

(এর ফলে) ডেনমার্কে পরমানুশক্তি কার্যত 'বেআইনী' গণ্য হ'ল। 1973 এ ডেনমার্কে বিদুৎ (উৎপাদন) মন্ত্রক কর্তৃক পরমানুশক্তি ব্যবহারের নীতি গৃহীত হবার পর বিগত 11 বছরের সক্রিয় বিরোধিতার ফলেই এটি সম্ভব হ'ল। পরমানুশক্তি ব্যবহারের নীতি তৎকালে গরিষ্ঠ সংখ্যক—রাজনৈতিক পার্টির সমর্থন পেলেও সাধারণ মানুষ ক্রমশ বেশী সংখ্যায় এই নীতির বিরোধিতা করে আসছিলেন। বিগত বছরগুলির তীব্র বিতর্কের মধ্য দিয়ে এখন এত-বেশী মানুষ পরমানু শক্তির বিরোধী হয়ে উঠেছেন যে গন-ভোটে পরমানু শক্তি ব্যবহার কখনই অনুমোদন পাবে না—নিঃসন্দেহে একথা বলা যায়। পার্লামেণ্টের বর্তমান সিদ্ধান্ত এই সত্যেরই প্রতিফলন এবং সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহনের পক্ষে স্বীকৃতি।

OOA-এই সিদ্ধান্তকে বিরাট জয় হিসেবে স্বাগত জানাচ্ছে। কিন্তু তারা এও জানে যে যতক্ষণ না সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে সিদ্ধান্তটি একটি প্রতীকি ভঙ্গিমা মাত্র এবং যে কোন মুহূর্তে তা বদলেও যেতে পারে। বিগত এগার বছর সরকারী রাজনীতি পরমানু শক্তিকে গরুত্ব দেওয়ায় শক্তির অন্যান্য সম্ভাবনা আমল পায়নি। বিদুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরমানু শক্তি অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত—। এখন সময় এসেছে নতুন এমন এক শক্তিনীতি গ্রহণ করার যা হবে একাধারে নমনীয়, নিশ্চিত ও বিকেন্দ্রীভূত এবং পরিবেশ, কর্মসংস্থান ও জাতীয় অর্থনীতিতে সুফলদায়ী।

OOA-নতুন শক্তিনীতির যেসব বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি দাবী করেছে, তার অন্যতম হল :

—শক্তির অপচয় রোধ ও অধিকতর কার্যকরী শক্তিব্যবস্হা।

—নবীকরণযোগ্য শক্তির অধিকতর গুরুত্ব। নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবস্হার সংগঠনা ও গবেষণায় রাষ্ট্রের ভুর্মিকা।

—নতুন বৃহদায়তন কয়লা বা তৈলভিত্তিক (শক্তি) কেন্দ্র স্হাপন বন্ধ।

—শুধুমাত্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক উৎপাদন সংস্হার মাধ্যমে বিদুৎ উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি—ইন্ধন হিসেবে শুধুমাত্র ন্যাচারাল বা জৈব গ্যাসের ব্যবহার।

এসব করতে গিয়ে সাধারণ গৃহস্হ ও আঞ্চলিক সংস্হাগুলিকে যাতে দুরবস্হার মধ্যে পড়তে না হয় এবং নতুন লগ্নীর ব্যবস্হা যাতে তারা করতে পারে তার জন্য যথেষ্ঠ আর্থিক উৎসাহ তাদের যোগাতে হবে বলেও OOA দাবী করেছে। তাছাড়া, বিদ্যুৎ-উৎপাদন পরিচালনও আরো গণতান্ত্রিক করতে হবে যাতে তারা ব্যবহার-কারীর প্রয়োজনাদির প্রতি নজর দিতে পারে এবং নিজস্ব শক্তিনীতি অনুসরণ করতে পারে—রাষ্ট্রের (চাপানো) নীতি নয়। জাতীয় শক্তি নীতি ছাড়াও আনুষঙ্গিক কয়েকটি বিষয়েও OOA সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রেখেছে ;

পরমাণু শক্তির জন্য চিহ্নিত ও সংরক্ষিত 15টি এলাকা অবিলম্বে অন্যবিধ ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিতে হবে।

সুইডেনের Barsebak পরমাণু শক্তিকেন্দ্র—যা কোপেনহেগেন থেকে মাত্র 20 কিমি দুরে অবস্হিত—সেটি বন্ধ করার দাবী জানাবার জন্য ড্যানিশ পার্লামেণ্টকে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

—পরমাণুশক্তির গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য RISO সহ অন্য যেসব গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ক্রোনার বরাদ্দ করা হয়—তা অন্যান্য (শক্তির) খাতে বরাদ্দ করতে হবে। এই লক্ষ্যে RISO-র কার্যক্ষেত্রের পুনর্বিন্যাস বা সংকোচনও শুরু করতে হবে।

—IAEA, OECD, NEA, EUROATON, A. O এই সংস্হাগুলি সহ সমস্ত আন্তর্জাতিক পরমাণু প্রকল্পে অর্থসাহায্য বন্ধ করতে হবে।

—ড্যানিশ জলসীমানার মধ্যে যাতে বিকীরক পরমাণু আবর্জনা বা শোধিত ইউরেনিয়াম পরিবাহিত না হয় সে বিষয়ে ডেনমার্ককে সক্রিয় হতে হবে। সুইডিশ রিয়াক্টরে ব্যবহৃত জ্বালানীর পরিবহনেরও বিরোধিতা করতে হবে।

—যেহেতু পরমাণু শক্তির নাগরিক ও সামরিক ব্যবহারের মধ্যে সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে, পরমাণু সম্পর্কিত কারিগরী জ্ঞান যাতে আরও ব্যাপ্তিলাভ না করে তার জন্য ডেনমার্ককে আন্তর্জাতিক-ক্ষেত্রে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। অন্যথায় পরমাণু-অস্ত্রের সজ্জা ও সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেই চলবে।....

এপ্রিল মাসে OOA অন্য কয়েকটি সংগঠনের সহযোগিতায় অম্ল বৃষ্টি বিষয়ে জাতীয় প্রচারের আয়োজন করছে। অর্থসাহায্য ও নতুন কর্মী সংগ্রহের জন্যও একটি জাতীয় প্রয়াস শুরু হয়েছে। OOA-র ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রের ইঙ্গিতবাহী নিম্নোক্ত শ্লোগানগুলি এইসব প্রচারে ব্যবহার করা হচ্ছে ঃ

শক্তি সাশ্রয় * শক্তি উৎপাদনের বিকেন্দ্রীকরণ * নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার * কয়লার ময়লা ও অ্যাসিড থেকে রেহাই, * Barseback বন্ধ হোক *

পুনশ্চ ঃ

OOA সকলকে জানাতে চায় যে পার্লামেণ্টে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হলে সন্ধ্যা থেকে পরদিন ভোর পর্যন্ত এই সময় আমাদের শ্যাম্পেনাদি সহযোগে দারুণ ফূর্তিতে কাটল। OOA দুঃখিত যে পৃথিবীর দেশে দেশে ছড়িয়ে থাকা বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের এই বিজয়োৎসবে কাছে পায়নি। কিন্তু তাদের নিজস্ব বিজয়োৎসবের দিনের দিকে OOA তাকিয়ে থাকবে। স.ম., বি-ও-বি"

পারমানবিক চুক্তির সংকট

1951 সালে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই তিনটি দেশ ANZUS নামে এক পারস্পরিক প্রতিরক্ষা জোট তৈরী করে। এই চুক্তির মাধ্যমে সদস্য দেশগুলি তাদের বন্দরগুলিকে সামরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে ব্যবহার করতে পারতেন। মূলতঃ এই সুবিধা ভোগ করতো আমেরিকাই। 33 বছর পর এই জোটে এক সংকটময় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে কতকগুলি কারণে, যা পৃথিবীর যুদ্ধবিরোধী শান্তিকামীদের মনে প্রভূত আশার সঞ্চার করেছে।

প্রথমতঃ, কিছুদিন আগে নিউজিল্যাণ্ডের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ডেভিড লেঞ্জ (David Lange) USA-কে জানিয়ে দেন যে তাঁর সরকার USA-এর কোন যুদ্ধজাহাজকে তাঁদের বন্দরে প্রবেশের অনুমতি দেবেন না, যদি না USA তাঁর সরকারকে এমন নিশ্চয়তা দেন যে ঐ সব যুদ্ধজাহাজ কোন পারমাণবিক অস্ত্র বহন করছে না। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ USA গত মার্চ মাসে "ANZUS Sea Eagle"-এর কুচ্‌কাওয়াজ তড়িঘড়ি বন্ধ ক'রে দেয়। এর দ্বারা USA বোঝাতে চেয়েছে যে, জোটের কোন সদস্য দেশ আমেরিকার সামরিক গতিবিধির উপর কোন প্রকার সীমা আরোপ করার চেষ্টা যেন না করে।

এর কিছুদিন পরেই অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট হক (Robert Hawke) USA-এর সাথে তাঁর দেশের বিতর্কিত MX-ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা সংক্রান্ত চুক্তি থেকে পিছিয়ে আসেন। কারণ হিসাবে তিনি বলেন যে তাঁর শাসক শ্রমিক দলের (Labour party) ভিতর থেকে তাঁর উপর চাপ দেওয়া হ'চ্ছে। এই সমস্ত কারণে একদা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার সহযোদ্ধাদের উষ্ণ সম্পর্কে ইদানিং হিমায়ন শুরু হয়েছে।

অবশ্য ক'য়েক মাস আগে থেকেই ANZUS-এর মধ্যে এই সংকট ঘনীভূত হওয়া শুরু হ'য়েছিল। প্রধানমন্ত্রী হক যখন 9 দিনের ব্রুসেলস্‌ ও ওয়াশিংটন সফরে বেরিয়েছিলেন ঠিক তখনই অস্ট্রেলিয় সাপ্তাহিকী National Times লিখল, প্রধানমন্ত্রী তার পার্টির পরমাণু অস্ত্রবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি কোন প্রকার শ্রদ্ধা না দেখিয়ে গোপনে USA-এর সাথে (সম্ভবতঃ) Sydney-তে MX ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার Staging Base তৈরীর চুক্তি করেছেন। এর পর হক-এর শ্রমিক পার্টির মধ্যে ঐ বিষয় নিয়ে তীব্র সমালোচনা হয়; ফলে ওয়াশিংটন সফরে গিয়ে হক জর্জ শুল্‌জকে জানিয়ে দিতে বাধ্য হন যে রাজনৈতিক কারণে তাঁর পক্ষে আগের চুক্তি বলবৎ রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

ANZUS-এর অংশীদার এই দুই দেশের বর্তমান আচরণে এই ধরনের পরিবর্তনের কারণ ঐ দুই দেশের জনসাধারণের মধ্যে পরমাণু অস্ত্রবিরোধী মনোভাবের তীব্রতা বৃদ্ধি। প্রাক্‌নির্বাচনী প্রচারের সময় উভয় দেশেরই বর্তমান শাসক রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাঁরা ক্ষমতায় এসে পরমাণু অস্ত্রবিরোধী ভূমিকা নেবেন। তাই এখন তাঁদের পক্ষে আর দলীয় নীতির পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়।

USA-এর সিনেট এবং রেগান প্রশাসন, নিউজিল্যাণ্ডের সাহসী পদক্ষেপে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করলেও আমেরিকার সিনেটেরই এক সদস্য মন্তব্য করেছেন যে, সমস্ত ব্যাপরটা নিয়ে আমেরিকা যে ভাবে অগ্রসর হচ্ছে, নিউজিল্যাণ্ডের প্রতি যে ধরনের ব্যবহার করা হচ্ছে, বা ভবিষ্যতের যে পরিকল্পনা করা হ'চ্ছে তা বুমেরাং হয়ে যেতে পারে। তিনি আরও বলেছেন, সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে অন্যভাবে অগ্রসর হওয়ার পথ ছিল। কোন নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকে কোন দুর্ভাগ্যজনক বা বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ফেলা উচিৎ নয়।

সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতা স্তব্ধ করার ক্ষেত্রে নিউজিল্যাণ্ডের এই পদক্ষেপ প্রকৃতই ঐতিহাসিক। এর ফলে পরমাণু অস্ত্র বিরোধী দেশ ও সংস্থাসমূহ উদ্দীপ্ত হবে এবং পৃথিবীর সমস্ত যুদ্ধবিরোধী মানুষের মনে আশার সঞ্চার হবে।

সুখেন্দু সরকার

স্বাস্থ্য-ওষুধ-মানুষ

ডাঃ সুজিত কুমার দাস

সরকারি চিকিৎসকদের সংগঠন 'হেলথ সার্ভিসেস এ্যাসোসিয়েশন' কর্তৃক আয়োজিত জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে একটি সেমিনারে বক্তৃতা দিয়েছিলাম। এক চিকিৎসক প্রশ্ন করলেন, "গরীব লোকের কাছে জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা বলতে গেলে সে বললো—আমার বাচ্ছাদের আমি খাওয়াবো, আমি মানুষ করবো—আপনি তো করবেন না; তাহলে আপনি ওসব কথা বলতে এসেছেন কেন?—এই প্রশ্নের কি কোন উত্তর আছে?" কোন উত্তর জোগাতে পারিনি। এক পণ্ডিত ব্যক্তি একদিন বললেন, "জন্মনিয়ন্ত্রণের দরকারটা কি? বিজ্ঞানীরা তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে বর্তমান হারে জন্মসংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকলে আগামী 500 বছরেও কোন অসুবিধে হবেনা; পৃথিবীর জমিতে যা সম্পদ আছে তাতে কুলিয়ে যাবে; আর সমুদ্রের সম্পদ আহরণ করতে পারলে তো কথাই নেই—অফুরন্ত সম্পদ। আসলে দরকার—উৎপাদন বৃদ্ধি ও সমবন্টন।" এ প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারিনি।

কিন্তু এ তর্কটা শিকেয় তুলে রাখলে বাস্তব সত্য হলো—আমরা সকলেই মেনে নিয়েছি যে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে এবং এটা খুবই জরুরী। প্রয়োজনটা বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র লোকেদের জন্য—কারণ ওদের সংখ্যাই দ্রুত বাড়াছে। বেশ কয়েক বছর ধরে বিশ্বের ধনী দেশগুলো অঢেল টাকা দিচ্ছে আমাদের দেশের সরকারকে এই কাজের জন্য। প্রভূত গবেষণা চলছে, নানা ধরনের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি আবিষ্কৃত হচ্ছে এবং চালু করা হচ্ছে। কিন্তু ঠিক মনের মত কোন পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সম্প্রতি চালু করা হচ্ছে NET-EN নামে একটি ইনজেকশন। প্রচারিত হয়েছে—এটাই সবচেয়ে ভাল ওষুধ এবং দরিদ্র অশিক্ষিত মেয়েদের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। রাসায়নিক নাম 17-ethinyl-4-oestren-3-one-17 beta heptanoate, সংক্ষেপ নেট-এন। এই ইনজেকশন-এর এক বিরাট সুবিধে হচ্ছে—অনেকদিন পরপর দিতে হয় (2 মাস অন্তর), গ্রহনকারীর স্মৃতিশক্তি বা দায়িত্ববোধের উপর ততটা নির্ভর করার দরকার নেই, এবং বেশ কার্যকরী। জন্মনিরোধক পিল বা বড়িতে যা হয়, নেট-এন এর কাজের প্রক্রিয়াও একই ধরনের। ইনজেকশন বন্ধ করে দিলে গর্ভধারণ ক্ষমতা আবার কয়েক মাসের মধ্যেই ফিরে আসে এবং চলাকালীন যৌনক্ষমতা, যৌনআকাঙ্খা ও যৌনক্রিয়ার উপর কোন প্রভাব ফেলেনা। দেড় বছর ধরে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে, ভারত সরকারের নির্দেশে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ (ICMR) নেট-এন ভারতীয় নারীদের উপর প্রয়োগ করে ফলাফল যাচাই করছেন। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও সরকারি হাসপাতালকে এই কাজে লাগানো হয়েছে।

এটা কি ঠিক হচ্ছে? নেট-এন কি আমাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয়? নানা বিজ্ঞানী ও সমাজকর্মী দৃঢ়ভাবে এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। এর গুণাগুণ আলোচনা করার আগে একটা পুরোনো কাহিনী জানা দরকার। নেট-এন এর আগে আর একটি ঐ ধরনের ওষুধ চালু করার চেষ্টা হয়েছিল—তার নাম Depo-Provera (DP) বা Depot Medroxy Progesterone Acetate (DMPA)—উৎপাদক আমেরিকার আপজন কোম্পানী। গত 15 বছর ধরে লড়াই করেও আপজন কোম্পানী DMPAকে আমেরিকায় চালু করতে পারেননি। কারণ আমেরিকার ভেষজ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ওষুধটির নিরাপত্তার (safety) সন্দেহাতীত প্রমাণ চাইছেন। পশুদের, বিশেষত বাঁদরের উপর প্রয়োগে দেখা গেছে জরায়ুর প্রদাহজনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে এবং স্তন ও জরায়ুর ক্যান্সার হয়েছে। ফলে মানবদেহে প্রয়োগের সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকর প্রভাব হিসেবে ক্যান্সার হতে পারে। সুদূরপ্রসারী প্রভাবের উপযুক্ত গবেষণামূলক তথ্য ছাড়া মার্কিন সরকার DMPA-কে লাইসেন্স দিতে অস্বীকার করেছেন। আপজন কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের কিছু দেশের অশিক্ষিত নারীদের উপর DMPA প্রয়োগ করেছে এবং সে সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক রিপোর্টও তৈরী করেছে, কিন্তু সে সব দেশেও কোম্পানী ঐ সব মহিলা গিনিপিগদের ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী সমীক্ষা করেনি, ফলে সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কোন তথ্য মেলেনি। বাংলাদেশে আন্দোলনের ফলে DMPA চালু করা সম্ভব হয়নি। কোন এক অজ্ঞাত কারণে ভারত সরকার DMPA-কে এদেশে চালু করার অনুমতি দেননি।

কিন্তু নেট-এন এর ক্ষেত্রে তৎপরতার সাথে অনুমোদন মিলেছে। ICMR-এর সমীক্ষার ফলাফল গোপন রাখা হয়েছে। যেটুকু জানা গেছে—নেট-এন এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া DMPA-এর মতই। ব্যবহারকারীদের অত্যধিক রক্তক্ষরণ হতে পারে, মানসিক অবদমন হতে পারে, দেহে ফ্যাট জমতে পারে, ইত্যাদি। এগুলি কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়,—বিশেষত ভারতীয় নারীদের ক্ষেত্রে, যাদের অধিকাংশই রক্তাল্পতায় ভোগেন। দেহের metabolic প্রক্রিয়ার উপর কোন বৈকল্য সৃষ্টি যদি এইসব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কারণ হয় তাহলে কিন্তু বিপদের কথা। ICMR বলেছেন—স্তন বা জরায়ুর ক্যান্সার থাকলে, বহুমূত্র রোগ, লিভারের রোগ, জণ্ডিস, রক্তবাহী শিরার রোগ, এমন কি মায়ের যদি স্তনদুগ্ধপায়ী শিশু থাকে—তাহলে তাদের নেট-এন দেওয়া নিষেধ। ICMR এও বলেছেন—নেট-এন 3 মাস অন্তর দিয়ে দেখা গেছে ব্যর্থতার হার একটু বেশী (অর্থাৎ নেট-এন পাওয়া সত্ত্বেও অনেকে গর্ভধারণ করেছেন), তাই এখন 2 মাস অন্তর দিয়ে ফলাফল যাচাই করা হচ্ছে। কিন্তু এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে, এ পদ্ধতিতে আগের চেয়ে বেশী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় কিনা। ICMR-এর বক্তব্যের অর্থ, নেট-এন এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্ভবত যথেষ্ট এবং যে সব রোগে নেট-এন দেওয়া নিষিদ্ধ, সে সব রোগ নেট-এন নিজেই সৃষ্টি করতে পারে, অন্তত করতে যে পারে না এমন কোন তথ্য বিজ্ঞানীদের কাছে নেই, ICMRএর কাছেও নেই।

এ অবস্থায় নেট-এন চালু করা হলো কেন? নিশ্চয়ই ভারত সরকারের উপর কোন শক্ত চাপ পড়েছে। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও নিরাপত্তার প্রশ্ন তুললে সরকারের বা কোম্পানীর বশংবদ চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীরা বলেন যে আমাদের ঝুঁকি ও লাভ তুলনা (risk-

benefit ratio) করে দেখতে হবে। এইসব গর্ভনিরোধক ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় যত জন নারী মারা যেতে পারে, সন্তান প্রসব করতে গিয়ে এদেশে তার চেয়ে বেশী নারী মারা যায়। সুতরাং নেট–এনকে নিরাপদ বলা যায়। এই 'অকাট্য' যুক্তির বিরুদ্ধে আর কোন বক্তব্য থাকে না। যারা তর্ক করবেন—তাহলে তো ক্ষতিকর কীটনাশক ও অন্যান্য ওষুধের বেলা একই অকাট্য যুক্তি দেওয়া যায়—এ আলোচনায় তাদের বাদ দিচ্ছি।

একটা খট্‌কা অবশ্য লাগে। জন্ম নিয়ন্ত্রণের এইসব ক্ষতিকর ওষুধগুলির আবিষ্কার ও প্রয়োগ শুধু নারীদের ক্ষেত্রেই হচ্ছে। পুরুষদের জন্য কোনরকম গবেষণা হয় না কেন? বলতে পারেন—এই সব প্রশ্ন নিয়ে হৈ চৈ করার কথা নারীমুক্তি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের। তাঁরা কি কিছু করছেন? বা করবেন?

বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সদস্য চাঁদা বাড়ল

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সদস্য চাঁদা বাড়ল 1985-86 সাল থেকে। নতুন চাঁদার হার বছরে পনের টাকা। বি-ও বি-র দাম ও গ্রাহক চাঁদা আগেই বেড়েছিল। তারই সঙ্গে তাল রেখে বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সদস্য চাঁদার এই 'ইনফ্লেশান'। চাঁদা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত সংস্থার সাধারণ সভায় গৃহীত হয়েছিল দু' বছর আগেই, সেই সিদ্ধান্ত এবারে কার্যকর করা ছাড়া আর উপায় রইল না।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার চাঁদা অনেক সদস্যের বাকী পড়ে থাকছে। সময়মত রিনিউ করানো দরকার। প্রতি বছর 30শে এপ্রিলের ভিতর চাঁদা জমা দিলে ভাল হয়। চেক বা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট পাঠাতে পারেন। **কলকাতার বাইরে থেকে চেক পাঠালে দু টাকা সার্ভিস চার্জ অতিরিক্ত।**

বি ও বি-র গ্রাহকদেরও অনুরোধ করছি সময়মত গ্রাহক চাঁদা পাঠান। মানি অর্ডারে টাকা পাঠালে কুপনের নিচের অংশে প্রেরকের নাম ঠিকানা লেখা থাকা আবশ্যক।

স. ম., বি. ও. বি.

a forthcoming
RWAIA Publication

THE INDIAN BIG BOURGEOISIE

—Its genesis, growth and character
by—**SUNITI KUMAR GHOSH**
Price : Rs. 45.00 (Paper back)
Price : Rs. 100.00 (Library Edition)
For Pre-Publication subscribers : Rs. 25.00
upto 31.5.85
Add. : 8, Dinanath Chatterjee St, Cal-56.

সঞ্জীবনী

ছড়া ঃ

টনিক খেলে হয় না কিছু ?
বলছি আমি—সত্য নয়!
দেখছি আমি টনিক খেয়ে
আমার ভীষণ তাকৎ হয়।

অসুখ হলেই তাইতো আমি
চামচ চামচ টনিক খাই
পেটের অসুখ? চিন্তা কিসের
একটা ভালো টনিক চাই॥

ঠাণ্ডা লেগে যখন আমার
হতেই থাকে কেবল কাশি,
আমি কিন্তু টনিক কিনে
খেয়ে দেখি ভালই আছি।

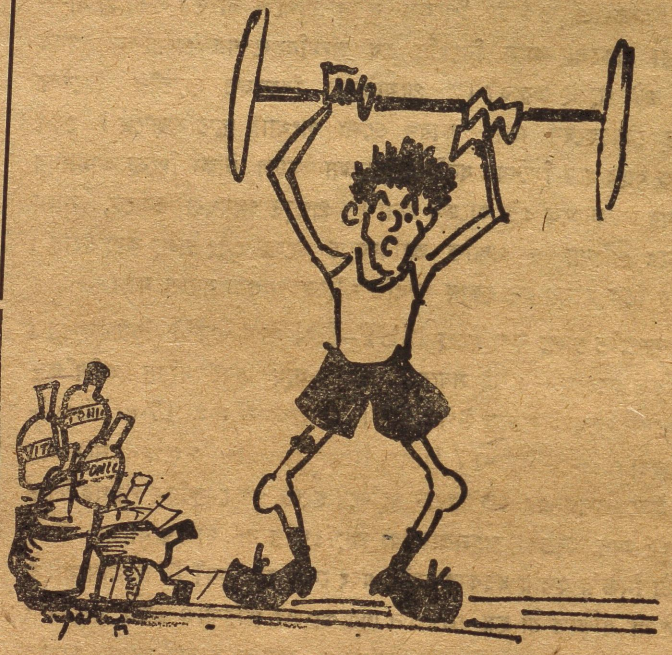

কাঁদে যখন আমার খোকা
তাকেও থামাই টনিক দিয়ে,
বউ বলল,—"পেটে ব্যাথা"
দৌড়ে এলাম টনিক নিয়ে

টনিক খেতে মিষ্টি অতি
টনিক আনে হালকা ঘুম
দেশ জুড়ে তাই টনিক খাওয়ার
আজ লেগেছে প্রবল ধুম॥

সুজন সেন

টেকনোলজি ডাম্পিং —সঙ্গে রোগ ও মৃত্যু

আবর্জনা ফেলার জন্য সবারই একটুখানি জায়গা দরকার।—বাড়ীর আবর্জনা হোক, কি পাড়ার জঞ্জাল হোক। এর একটা ব্যবস্থা যে যার নিজের এলাকা বা পাড়াতেই করেন আমরা জানি। কিন্তু গন্ডগোল বেঁধেছে বিশেষ কিছু আবর্জনা নিয়ে। যেগুলি মানুষের বা যেকোন প্রাণের পক্ষেই ক্ষতিকর। যেমন নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টের তেজস্ক্রিয় ভস্ম। এই আবর্জনা ফেলা হবে কোথায়? সমস্যাটা বিশেষ করে ধনী দেশের।

এমন অবস্থায় অনুন্নত দেশের কিছু কর্তা এগিয়ে এসেছেন সাহায্যে। তারা রাজি হয়েছেন তাদের জমি ছেড়ে দিতে—ডাম্পিং এর জন্য।—জোর জুলুম ছাড়াই। যেমন, ইরান, আর্জেন্টিনা, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশ। তবে বিনি পয়সায় নয়। আসল ধান্দা কিছু কামিয়ে নেওয়া এই মওকায়। সিদ্ধান্ত যারা নিচ্ছেন স্বভাবতঃই তাদের কোন ঝুঁকি নেই।—থাকবেন শহর এলাকায়। ক্ষতি যা হবার হবে সেই সুদূর কোনো অজ গাঁয়ের লোকেদের, যেখানে ডাম্পিং হবে সেই ভস্ম।

এই হল এক ধরনের ডাম্পিং। আর এক ধরনের ডাম্পিং আছে। যেমন, একটি গোটা কারখানাই যখন আবর্জনায় পরিণত হচ্ছে তাকে নিয়ে ডাম্প করা আর এক জায়গায়।—আর এক দেশে। স্বভাবতঃই অনুন্নত কোন দেশে।

উন্নত দেশগুলিতে ক্রমাগত গবেষণায় ধরা পড়ছে পরিচিত বহু শিল্প-কারখানা শ্রমিকদের নানা রোগ ও মৃত্যুর উৎস। সেখানে প্রতিরোধ বাড়ছে। কারখানা চালানো অসুবিধে হচ্ছে। সেগুলি ক্রমে পাচার হচ্ছে অনুন্নত দেশে।

'পেরিল্‌স ফর প্রফিট'

1981 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি পত্রিকা "নিউজ ডে", "Hazards for Export" শিরোনামে দীর্ঘ দশ কিস্তিতে বিশদ একটি রিপোর্ট বের করেছে। বলা হয়েছে বড় বড় মাল্টি ন্যাশানাল কোম্পানীগুলি কিভাবে সুপরিকল্পিতভাবে এই কাজ করে চলেছে। এর মধ্যে Drug ও Pesticide-এর কারবারও রয়েছে। এদের ঘোষণা—"U S Companies exporting Perils for profit"।

নতুন কারখানা এলো—সাথে কিডনী রোগ

জাকার্তার অদূরে ইউনিয়ন কার্বাইডের ব্যাটারী কারখানা বসেছে। ইন্দোনেশিয়ার মত দেশ—বোঝাই যায় শিল্প সংক্রান্ত আইনকানুন ঢিলেঢালা হবে। সস্তা শ্রম আর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফাঁক ফোকড় দেখেই এই উপহার। বিপদ ধরা পড়ল এক স্বাস্থ্য সমীক্ষার পর। ওই কারখানায় কাজ করে সাড়ে সাতশ কর্মী। দেখা গেল এদের পঞ্চাশ শতাংশের বেশী কর্মী ভুগছে একটি বিশেষ রোগে।—কিডনী সংক্রান্ত অসুখ। অনুসন্ধান করে জানা গেল রোগের উৎস রয়েছে কারখানার ভেতরই। তাদের ব্যবহৃত পারদ এর উৎস।

ক্যান্সার ও মৃত্যুর দোসর আর্সেনিক, অ্যাজবেস্‌টস

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Asarco তে তৈরী হয় আর্সেনিক ট্রাই অক্সাইড। ধরা পড়ল ওই কারখানার কর্মীরা ভীষণভাবে ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছেন। বলাই বাহুল্য এর জন্য দায়ী বিষাক্ত আর্সেনিক। সমীক্ষায় জানা গেল রোগাক্রমণের হার স্বাভাবিক অপেক্ষা পাঁচশ শতাংশ বেশী। স্বভাবতঃই বিক্ষোভ বাড়ল। ওপর থেকে নির্দেশ এলো কারখানার মধ্যে আর্সেনিকের মাত্রা কমাতে হবে পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগে।

Asarco বুঝল—বিপদ। এক বছরে আঠাশ শতাংশ উৎপাদন কমিয়ে আনল। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এরাই সবচেয়ে বড় উৎপাদক। দেশে ঘাটতি দেখে বাইরে থেকে এর আমদানি বেড়ে গেল চার বছরে তিনগুণ। কোথা থেকে আসছে সেই আর্সেনিক? —মেক্সিকোর Industrial Minera Mexico থেকে। আর একটু খোঁজ নিতেই জানা গেল Asarco ওই কোম্পানীর চৌত্রিশ শতাংশের মালিক।

অ্যাজবেস্‌টস্‌ শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের বিপদের ঝুঁকি সম্পর্কে সকলেই জানেন। সেই সুদূর 1918 সালেই বীমা কোম্পানীগুলি ওই কর্মীদের জীবন বীমা করত না। উন্নত দেশগুলিতে দারুণ বিরোধিতা এই শিল্পে। অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে উৎপাদন কমছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাধ্য হয়েছে অ্যাজবেস্‌টস্‌-এর আমদানী বহুগুণ বাড়াতে। কোত্থেকে আসছে সেই অ্যাজবেস্‌টস্‌?—মেক্সিকো, ব্রাজিল, তাইওয়ান থেকে।

ভারতে অবস্থিত অ্যাজবেস্‌টস্‌ কারখানাগুলির চরম অব্যবস্থার কথা অনেকেই জানেন। প্রতিরোধ-সরঞ্জাম প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ এখানকার প্রধান দুটি উৎপাদক সংস্থারই বিদেশী কোম্পানী সহযোগী। একটি বৃটিশ বহুজাতিক সংস্থা Turner & Newall। অপরটি মার্কিন যুক্তরাজ্যের Johns Manville। এরা কি নিজেদের দেশের মাটিতে এধরণের অবহেলা চালাতে পারবে?—মোটেই না।

সমাধান?

—খুবই শক্ত। সর্ষের মধ্যেই ভূত। উন্নয়নের নামে এই সব অনুন্নত দেশ নিজে থেকেই হেন্য হয়ে ফিরছে শিল্প প্রযুক্তির জন্য। সুযোগ বুঝে মাল্টিন্যাশানালরা ঢুকিয়ে দিচ্ছে এইসব শিল্প কারখানা।—বিপদ জেনেও। এদের বক্তব্য উন্নয়নের জন্য এই "যৎসামান্য" মূল্য তো দিতেই হবে। মেক্সিকো, তাইওয়ান, ভারত, ইত্যাদি দেশের কর্তাদেরও এটাই বক্তব্য।

নমুনা হিসেবে ব্রাজিলের এক অর্থনীতিবিদের উক্তি উল্লেখ করি—"Industry is a necessary evil. There is no use having a beautiful picturesque city when

people have no place to work. It is economic price under-developed countries must pay"। আমাদের দেশের উন্নয়ন-বিশেষজ্ঞদের মনের কথা এটাই।

বোধহয় ব্যাখ্যা করে বলার দরকার নেই, দেশের কোন অংশের মানুষকে দিতে হচ্ছে সেই মূল্য।—আর মধু চাকছে কারা!

[International Labour Report-এর মার্চ-এপ্রিল '85 সংখ্যায় Fred Hasson এর লেখা একটি রিপোর্টের ভিত্তিতে এই লেখা তৈরী করেছে রবীন চক্রবর্তী।]

চিঠিপত্র

"ধনতান্ত্রিক বিজ্ঞান বনাম জন-বিজ্ঞান" সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা।

'বি-ও-বি'র জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী' 1985 সংখ্যায় শ্রীমণীন্দ্র নারায়ণ মজুমদারের মনোযোগ আকর্ষণকারী সুপাঠ্য লেখাটি আমাকে উদ্দীপিত করেছে। এবং আমার কিছু সাবেকী চিন্তাকে নতুন করে ভেবে দেখতে বাধ্য করেছে। তার থেকে কিছু জিজ্ঞাসা মনে এসেছে সেগুলো আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করছি।

(1) জনবিজ্ঞানের সঠিক স্বরূপ ও স্থান নিয়ে বোধ হয় এখনও আলোচনা চলতে পারে। মণিবাবুর লেখায় ধনতান্ত্রিক বিজ্ঞানের বিকল্প হিসাবে জন বিজ্ঞানকে যেভাবে দাঁড় করানো হয়েছে তাতে তার স্থান "শোষণ হীন সমাজ" সৃষ্টি বা "রামরাজ্য" সৃষ্টির সমতুল্য হয়ে দাড়িয়েছে। ফলে এরকম ধারণা হতে পারে যে জনবিজ্ঞান একটা অবাস্তব, আদর্শবাদী ও রোমান্টিক ভাবনা যা কখনও মাটির ধূলায় নামিয়ে এনে সঠিক ভাবে কার্যকরী রূপ দেওয়া যাবে না এবং পৃথিবীর কুটিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লীলা খেলায় জনবিজ্ঞানের ধ্যান ধারণা মুক্তিকামী ব্যাক্তি মানসের কাছে একটা আদর্শবাদী হাতছানি হয়ে থাকবে।

(2) "প্রকৃতিই সবচেয়ে ভাল জানে" এই সত্যের গহবরে একটা প্রশ্ন প্রচ্ছন্ন আছে তা হলো—প্রকৃতির যে কোন কাজে হস্তক্ষেপ করা কি প্রকৃতির সাথে শত্রুতা করা? প্রকৃতি কি এতই অনমনীয় অবুঝ যে গায়ে হাত পড়লেই অভিমানে সব খেলনা ভেঙ্গে ফেলতে চাইবে? ভারসাম্য রক্ষায় কোনরকম বোঝাপড়ায় অনাগ্রহী? যদি তা না হয় তাহলে মানতে হবে সর্বক্ষেত্রেই একটা মাত্রাবোধ ও বিনিময়যোগ্য নীতি থাকবে যার মাধ্যমে বোঝাপড়ায় আসা এবং ভারসাম্য রক্ষা সম্ভব। প্রশ্ন হলো এই নীতিবোধ কিভাবে সমাজে জাগ্রত রাখা যায় এবং কার্যকরী করা যায়। পরিচিত বিজ্ঞান-প্রযুক্তি প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ এবং প্রকৃতির resource exploitation এর উপর নির্ভর থেকে ক্রমশঃ মুনাফা নির্ভর হয়ে পড়েছে। বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা গোড়াতে নৈতিকতাবোধ দিয়ে চালিত না হয়েও পরে মানবিক ও অমানবিক প্রয়োগে সমানভাবে সফল হতে পারে। মুনাফা লাভের সংকীর্ণ অথচ সাধারণভাবে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, বৃহত্তর মানবতাবোধ লঙ্ঘন করে বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায় বিকৃতি আনতে পারে। অথচ যে নীতিবোধ এই বিকৃতি এবং ভারসাম্যহীনতা রোধ করতে পারে তা শুধু আইন পাশ করে, সুচারু পরিকল্পনা করে, দান খয়রাত করে বা উপর থেকে ফরমান জারী করে সৃষ্টি করা যায় না। এটা সমস্ত মানুষের মানবিকতা বোধ ও সমাজবোধে সৃষ্ট এবং সচেতন ক্রিয়াকলাপে লালিত এবং সেই কারণে বর্তমান প্রযুক্তিবিদ্যার মতো প্রতিষ্ঠানের (Establishment) কাছে দায়বদ্ধ ও শৃংখলিত নয়। মানুষের প্রয়োজনেই প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং একই প্রতিষ্ঠান ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও বাজারের প্রসার ও মুনাফা লাভের সুযোগ সৃষ্টিতে নিয়োজিত থেকে মানুষের নীতিবোধকে আবদ্ধ করে। যে কোন বিজ্ঞান নীতি বা পরিকল্পনা (ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক বা জনবিজ্ঞানমূলক যেকোন কাঠামোর রূপ দেওয়া হোক না কেন) প্রতিষ্ঠানের আওতায় আসতে বাধ্য। তাহলে জনবিজ্ঞানমূলক চিন্তার সার্থকতা কোথায়?

(3) আমার ধারণা যে জনবিজ্ঞান একটা লাগাতার বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলন, কোন বিশেষ ধরণের বিকল্প পরিকল্পনা নয়, কোন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির প্রয়াসী নয়। এই আন্দোলন সমাজ ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সকলের নীতিবোধ জাগ্রত রাখবে এবং পরিবর্তনের প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের উপর সামাজিক (এবং রাজনৈতিক) চাপ সৃষ্টি করবে। যে কোন সমাজ ব্যবস্থায় এই আন্দোলন গড়ে তোলা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং আবশ্যক। ধনতান্ত্রিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি দ্বারা চালিত দেশে বা সমাজেও এই আন্দোলনকে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। কাজেই গণ আন্দোলন হিসাবে এটা একটা hypothetical concept নয়, মানবিক বোধ দ্বারা চালিত হয়ে পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ অংশ গ্রহণ করে এর রূপ দেওয়া সম্ভব।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মণিকবাবুর আলোচনায় প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সূত্র গুলো কি ধরণের সামাজিক নীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং জনবিজ্ঞান আন্দোলন কি ভাবে প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার কাজে সাহায্য করতে পারে সে সম্পর্কে একটা স্পষ্ট উপলব্ধি আসে বলে আমার মনে হয়েছে।

গৌতম ব্যানার্জী
বার্কলে, ইউ.এস.এ

দুইটি সন্তানের জন্ম সময়ের মধ্যে তিন বছরের ব্যবধান রাখুন

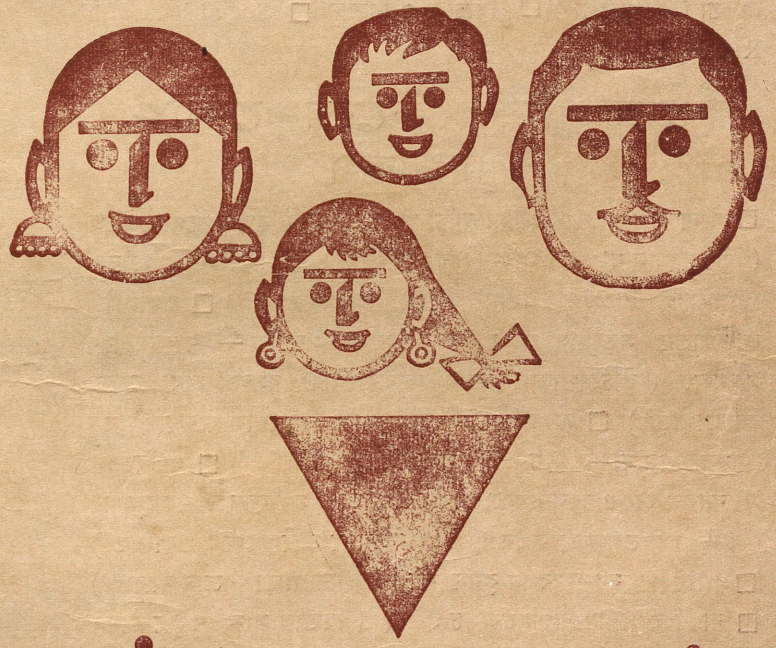

নিরোধ কপার টি খাবার বড়ি

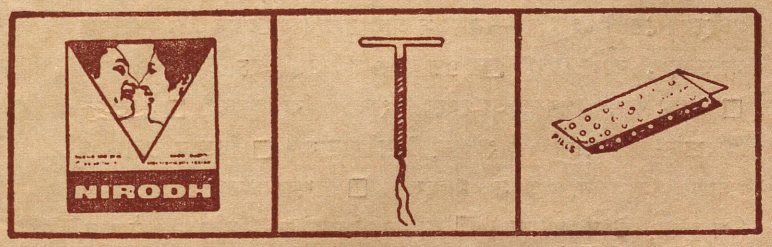

যে কোন একটি পদ্ধতি বেছে নিন

davp 84/225

R.N.34929/79

VIGYAN-O-VIGYANKARMI
c/o D. S. Enterprise.
52/9C, B.B. Ganguli Street, Cal-12

YEAR 8 NUMBER 5

Mar-Apr. 1985

পড়ুন ও পড়ান

☐ উৎস মানুষ ☐ প্রগতিবার্তা (কল্যাণী) ☐ বিজ্ঞান মণীষা (মেদিনীপুর) ☐ অঙ্কুরে শুরু ☐ লোকবিজ্ঞান (কাশীনগর) ☐ অন্বেষা ☐ অহল্যা ☐ গণস্বাস্থ্য (বাংলাদেশ) ☐ Manushi (দিল্লী) ☐ Parents and Pedagogues (উড়িষ্যা) ☐ Science for the People (USA) ☐ Medico Friends' Circle Bulletin (পুণে) ☐ জনবিজ্ঞান (আসাম) ☐ বিজ্ঞান ও সমাজ ☐ জ্ঞান বিচিত্রা (আগরতলা) ☐ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান ☐ Socialist Health Review ☐

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুস্তিকা

☐ মনোরোগ, মনোরোগী, মনোচিকিৎসা ও একটি নতুন পথের খোঁজে ('উৎস মানুষ' ও 'মানস'-এর যৌথ উদ্যোগে প্রচারিত ও মুদ্রিত, যোগাযোগ P 239 A কিয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা-17) ☐ কল্যাণী ঘোষপাড়ার সতীমার মেলা ও কর্তাভজা সম্প্রদায়—মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার (কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার 100, বসন্ত বাবু রোড, কাঁচড়াপাড়া) ☐ মালা বাড়ে রোগ সারে—অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় (উৎস মানুষ, বি ডি 494 সল্ট লেক, কলি-64) ☐ গণবিজ্ঞান আন্দোলন কি ও কেন-একটি প্রাথমিক খসড়া— মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার (অমূল্য মণ্ডল কর্তৃক বি 6/119 কল্যাণী নদীয়া থেকে প্রকাশিত) ☐ পরিবেশদূষণ—স্বপন কুমার শীল (কাচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার) ☐ না হিরোসিমা-নাগাসাকি চাই না (দ্বিতীয় সংস্করণ) সৌমেন গুহ (পঃ বঃ বিজ্ঞান কর্মী সংস্থা) ☐ হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান (বি-ও-বি সংকলন, পঃ বঃ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা) ☐ আন্দ্রিক 84 : মানুষের তৈরী মহামারী—নাজেস আফরোজ (বাউলমন 28, বালীগঞ্জ গার্ডেন্স, কলি-19) ☐ প্রশ্ন উত্তরে বাছ বিচার (বাউলমন) ☐ বাংলাদেশের গণস্বাস্থ্য থেকে সংকলন (বাউলমন) ☐ বিজ্ঞান-অবিজ্ঞান-অপবিজ্ঞান (সংকলন, উৎস মানুষ) ☐ বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ (সংকলন, উৎস মানুষ) ☐ শেকল ভাঙার সংস্কৃতি (সংকলন, উৎস মানুষ) ☐ কারেন সিলকউড (মহিলা পাঠাগার, 57B পিয়ারী মোহন রায় রোড, কলি-29) ☐ নারী মুক্তি আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় (মহিলা পাঠাগার) ☐ প্রমিথিউসের পথে (সংকলন, উৎস মানুষ) ☐ দূষণ : ত্রিবেনী থেকে কলকাতা— রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় (পিপ্‌লস ফোরাম, 32 বি সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলিকাতা-6) ☐ যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু (ভূপাল কমিটি 11 ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীট, কলিকাতা-1) ☐ ভূপাল ঘটনা না দুর্ঘটনা ? (গণ সাংস্কৃতিক সংস্থা, নতুন বাজার, সোদপুর 743178)

রবীন মজুমদার কর্তৃক ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে লক্ষ্মী প্রেস, 15/সি, পঞ্চানন ঘোষ লেন কলিকাতা-9 হইতে মুদ্রিত